বৈদিক সন্ধ্যা

(বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক এবং ব্যবহারিক ব্যাখ্যা)

- আচার্য অগ্নিব্রত

“যারা সৃষ্টির উপর বিচার না করে আস্থা আর বিশ্বাস বা পরম্পরার নামে ঈশ্বরের পূজা করে, তারা মানব জাতিকে অন্ধবিশ্বাসের গভীর অন্ধকারে ঠেলে দেয় আর যারা বিচার না করে অহংকারবশত ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তারা মানুষকে স্বচ্ছন্দ ভোগবাদী বানিয়ে পশুর থেকেও অধম বানিয়ে দেয়।

এইদিকে আমাদের বৈদিক বিজ্ঞান দুটোকেই সত্য মার্গে নিয়ে এসে মানবকে বাস্তবিক মানব বানায়। বৈদিক বিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধী নয়, বরং আধুনিক বিজ্ঞানের বাস্তবিক এবং অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান করতে সহায়ক।

– আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক

ওঽম্

বৈদিক সন্ধ্যা

(বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিকএবং ব্যবহারিক ব্যাখ্যা)

লেখক

আচার্য অগ্নিব্রত

সম্পাদক

ডা০ মধুলিকা আর্যা এবং বিশাল আর্য

উপপ্রাচার্য এবং প্রাচার্য, বৈদিক এবং আধুনিক ভৌতিকী শোধ সংস্থান

অনুবাদক

আশীষ আর্য

আর্য বীর দল

দ্য বেদ সাইন্স পাবলিকেশন

ভীনমাল (রাজস্থান)

প্রথম সংস্করণ, ২০২২

দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২৫

আশ্বিন শুক্ল ১০, বিক্রম সম্বত্ ২০৭৯, বিজয়াদশমী

দিনাঙ্ক : ০৫.১০.২০২২

সর্বাধিকার প্রকাশকের অধীন সুরক্ষিত

সংখ্যা : ২০০০

ডিজাইনিং আদি : বিশাল আর্য

অনুবাদক : আশীষ আর্য

PDF VERSION ONLY

মূল্য : ₹ ২০০

প্রকাশক : দ্য বেদ সাইন্স পাবলিকেশন
বেদ বিজ্ঞান মন্দির, ভাগলভীম, ভীনমাল
জেলা - জালোর (রাজস্থান) - ৩৪৩০২৯

ওয়েবসাইট: www.thevedscience.com,
www.vaidicphysics.org

ইমেল : thevedscience@gmail.com

সম্পর্ক সূত্র : ৯৫৩০৩৬৩৩০০, +৯১ ৯৮২৯১৪৮৪০০

সম্পাদকীয়

পরমপিতা পরমাত্মা এই সৃষ্টিকে রচনা করেছেন, তিনিই একে নিয়ন্ত্রিত বা সঞ্চালিত করছেন আর এক সময় পশ্চাৎ প্রলয়ও করবেন। তিনি সৃষ্টির রচনা জীবাত্মার জন্য করেছেন, এতে ঈশ্বরের নিজের কোনো স্বার্থ নেই। সম্পূর্ণ প্রাণীজগতের মধ্যে মানবকেই সবথেকে অধিক বুদ্ধি আর জটিল শরীর প্রদান করেছেন। আমরা শরীরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে আমাদের এক-একটা অঙ্গ কত মূল্যবান। এত সব কিছু পাওয়ার পরেও কি আমাদের এটা কর্তব্য নয় যে আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করি?

নিজের কৃতজ্ঞতাকে ব্যক্ত করার জন্য সংসারের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের ভিন্ন-ভিন্ন পূজা-পদ্ধতি তৈরি করেছে। আপনি কি কখনো ভেবেছেন যখন এগুলোর মধ্যে একটাও এই ভূমিতে ছিল না, তখন সংসারের মধ্যে কোন পদ্ধতিটা প্রচলিত ছিল? আর্ষ গ্রন্থের অধ্যয়ন করলে জানতে পারবেন যে সবার মধ্যে সন্ধ্যাকেই ঈশ্বরের পূজা অর্থাৎ স্তুতি, প্রার্থনা আর উপাসনার মার্গ বলা হয়েছে। যখন থেকে মানব জন্মেছে, তখন থেকে তারা এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে, মহাভারতের পশ্চাৎ এই পরম্পরা ধীরে-ধীরে সমাপ্ত হতে থাকে। ঋষি দয়ানন্দ পুনঃ আমাদের সেই পরম্পরার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন আর তখন থেকে আর্যরা (শ্রেষ্ঠজন) সন্ধ্যোপাসনা করছে।

সন্ধ্যা কি ?

সন্ধ্যা শব্দ ‘সম্’ উপসর্গপূর্বক ‘ধ্যৈ চিন্তায়াম্’ ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়াতে এর অর্থ হল – সম্যক্ রূপ দ্বারা চিন্তন, মনন, ধ্যান, বিচার করা আদি। সন্ধ্যাকে সংজ্ঞায়িত করে ঋষি দয়ানন্দ পঞ্চমহাযজ্ঞ-বিধির মধ্যে লিখেছেন –

‘সন্ধ্যায়ন্তি সন্ধ্যায়তে বা পরব্রহ্ম য়স্যাম্ সা সন্ধ্যা’

অর্থাৎ যেখানে পরব্রহ্ম পরমাত্মার ঠিক ভাবে ধ্যান করা হয়, তাকে সন্ধ্যা বলে। এরমধ্যে ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা আর উপাসনা করা হয়। অন্যদিকে ভগবান মনু সন্ধ্যোপাসনার বিষয়ে মনুস্মৃতিতে লিখেছেন –

পূর্বা সন্ধ্যাম্ জপন্স্তিষ্ঠন্নৈশমেনো ব্যপোহতি।
পশ্চিমাম্ তু সমাসীনো মলম্ হন্তি দিবাকৃতম্।। (মনুঃ ২/১০২)

অর্থাৎ – দুই সময় সন্ধ্যা করলে পূর্ববেলাতে আসা দোষের উপর চিন্তন-মনন আর পশ্চাত্তাপ করে পরবর্তীতে সেগুলো না করার সংকল্প করা হয়।

সন্ধ্যার ফল

সত্য সনাতন বৈদিক ধর্মের মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মার পূজা বা সন্ধ্যার অভিপ্রায় হল স্তুতি, প্রার্থনা আর উপাসনা। ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতীর অনুসারে –

'স্তুতির দ্বারা ঈশ্বরের মধ্যে প্রীতি, তাঁর গুণ, কর্ম, স্বভাব দ্বারা নিজের গুণ, কর্ম, স্বভাবকে শোধরানো, প্রার্থনার দ্বারা নিরভিমানতা, উৎসাহ আর সহায় প্রাপ্ত করা, উপাসনার দ্বারা পরব্রহ্মের সঙ্গে মিলন আর তাঁর সাক্ষাৎকার হওয়া।'

সন্ধ্যা কিভাবে করবেন ?

প্রাতঃ আর সায়ংকালের সন্ধিবেলাতে নিত্যকর্ম হতে নিবৃত্ত হয়ে পবিত্র এবং একান্ত স্থানে সিদ্ধাসন, সুখাসন বা পদ্মাসন লাগিয়ে সন্ধ্যার জন্য বসবেন। এরপর সমস্ত রাগ, দ্বেষ, চিন্তা, শোকাদি থেকে মুক্ত হয়ে শান্ত আর একাগ্রচিত্ত হয়ে পরমাত্মার ধ্যানে নিজের মন ও আত্মাকে স্থির করে সন্ধ্যোপাসনা করবেন।

পূজ্য আচার্যশ্রীর দ্বারা প্রতিপাদিত বৈদিক রশ্মি সিদ্ধান্তের অনুসারে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড (সূক্ষ্ম কণা থেকে শুরু করে বিশাল তারা পর্যন্ত) বেদ মন্ত্রের ঋচার দ্বারা নির্মিত আর আমাদের প্রাচীন ঋষি-মুনিদের মত এটাই ছিল। এই মন্ত্র বাণীর

পশ্যন্তী অবস্থায় সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিদ্যমান আছে। সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বেদমন্ত্র প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আর তাই সংস্কৃত হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের ভাষা। আমরা যখন বেদ মন্ত্রের উচ্চারণ করি, তখন এর প্রভাব সৃষ্টির উপর পড়ে, যদিও আমরা সেটা অনুভব করতে পারি না।

যারা প্রতিদিন সন্ধ্যা করে, প্রায়শঃ তাদের সন্ধ্যার মন্ত্রের সামান্য অর্থও জ্ঞাত থাকে না, যারফলে তাদের মন সন্ধ্যাতে সঠিক ভাবে লাগে না। এই বিষয়কে ধ্যানে রেখে আর অনেক ব্যক্তির আগ্রহে পূজ্য আচার্যশ্রী সন্ধ্যা মন্ত্রের ত্রিবিধ ভাষ্য (আধিদৈনিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক) করার নিশ্চয় করেন। পাঠক এই পুস্তকের মধ্যে সন্ধ্যার মন্ত্রের তিন প্রকারের ভাষ্য পড়তে পাবেন। এমন কাজ সংসারে এই প্রথমবার হয়েছে, এরজন্য আমরা সদা আচার্য শ্রীর ঋণী থাকবো। আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী মধুলিকা আর্যা এই পুস্তকের সম্পাদন এবং ঈক্ষ্যবাচন কুশলতাপূর্বক সম্পন্ন করেছেন, এইজন্য তাকে অভিনন্দন জানানো কেবল একটা আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

পাঠকদের উচিত –

১. সন্ধ্যার মন্ত্রের তিন প্রকারের অর্থকে ভালো ভাবে আত্মসাত্ করবেন।

২. এই মন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দ্বারা সৃষ্টিকে আরও অধিক গভীর ভাবে জানার চেষ্টা করবেন।

৩. এর ব্যবহারিক ব্যাখ্যাকে জেনে সেই অনুসারে আচরণের চেষ্টা করবেন।

৪. এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অনুসারে ভাবনা বানিয়ে সন্ধ্যা করবেন অথবা সন্ধ্যা করার সময় এইরকম ভাবনা করবেন।

– বিশাল আর্য

বৈদিক সন্ধ্যা করার বিধি এবং মন্ত্রের সঠিক উচ্চারণ জানার জন্য এই বারকোড স্ক্যান করবেন অথবা নিচে দেওয়া লিংকে যাবেন।

https://bit.ly/3xgHZUP

ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাম্ য়শশ্চ কীর্তিম্ চ ব্রহ্মবর্চসমেব।। (মনুঃ ৪/৯৪)

অর্থাৎ – মন্ত্রার্থদ্রষ্টা ঋষিগণ দীর্ঘ সময় ধরে সন্ধ্যোপাসনা করার কারণে দীর্ঘায়ু, প্রজ্ঞা, যশ, কীর্তি আর ব্রহ্মতেজকে প্রাপ্ত করেছেন।

ভূমিকা

স্বভাবত মানুষ বিপত্তিতে নিজের অধিক সামর্থ্যশালীর নিকট আশ্রয়প্রার্থী হয়। যেমন কোনো শিশু কারও দ্বারা ভয় পেলে সে দ্রুত তার মায়ের কোলে গিয়ে বসে আর নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে সুরক্ষিত অনুভব করে। ঠিক সেইরকম সংসারের সব ঈশ্বরবাদী, তা সে যেকোনো সম্প্রদায়ের হোক না কেন, সুখের সময় না হলেও, দুঃখের সময় তো অবশ্যই সে নিজের উপাস্যের পূজা করে, কেউ-কেউ তো কবরের নিকট নিজের দুঃখ দূর করার প্রার্থনা করে। যারা অনীশ্বরবাদী হয় আর ঈশ্বরের মতো কোনো শক্তির অস্তিত্বের উপর সর্বদা অহংকারপূর্বক ব্যঙ্গ করে, তারাও যখন কোনো বিশেষ আপত্তির সম্মুখীন হয়, তখন কোনো অদৃশ্য শক্তির নিকট নিজের প্রাণের ভিক্ষে চাইতে দেখা যায়।

এইভাবে মানুষ স্বভাবত আস্তিকই হয়, কিন্তু সে নিজের অহংকার বা খুব অজ্ঞানতার কারণে নাস্তিকতার চোরাবালিতে ফেঁসে যায় আর এরমধ্যেই নিজের গৌরব আর প্রগতিশীলতা মনে করে।

এখন আমি এখানে তাদের চর্চা করবো যারা নিজেকে ঈশ্বরবাদী বলে। সংসারে এদের সংখ্যাটাই অধিক, যদিও তারা ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুগামী, সবার পূজা-পদ্ধতি ভিন্ন-ভিন্ন। সবার ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা ভিন্ন-ভিন্ন আর এইজন্য তাদের পূজা-পদ্ধতিও ভিন্ন-ভিন্ন হয়। এইরকম হওয়ার কারণে ঈশ্বরবাদী একে-অপরের এমন শত্রু হয়ে আছে যে অনীশ্বরবাদীও তেমন একে-অপরের শত্রু হয় না। ইতিহাস একথার সাক্ষী যে সম্পূর্ণ সংসারের মধ্যে ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতার নামে যত হিংসা আর রক্তপাত হয়েছে, যত ঘৃণা আর দ্বেষের পরিবেশ হয়েছে, ততটা অন্য কোনো কারণে হয়নি।

বস্তুতঃ বর্তমানে প্রচলিত পূজা-পদ্ধতি মানুষকে কেবল ঈশ্বরের নিকট

প্রার্থনাকারী বানিয়ে দেয়, কিন্তু মানুষ যার কাছে প্রার্থনা করছে, তাঁকে সে ঈশ্বর, খুদা আদি যে নামই দিক না কেন, সেটা কিরকম? তাঁর স্বরূপ, তাঁর গুণ-কর্ম-স্বভাব কিরকম? এইসব চর্চা অধিকাংশ পূজা-পদ্ধতির মধ্যেই নেই। এই কারণে এইসব পূজা-পদ্ধতি এই সংসারকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগ তো করে দিয়েছে, কিন্তু এরমধ্যে অধিকাংশ পূজা-পদ্ধতি মানুষ নামক প্রাণীকে মানুষ করতে পারেনি। সমাজ, রাষ্ট্র আর বিশ্বের মধ্যে একতা, মৈত্রী আর সমতার ভাব উৎপন্ন করতে পারেনি। এর মূল হচ্ছে এটাই যে ঈশ্বরবাদী ঈশ্বরকে কেবল আস্থা আর বিশ্বাসের বিষয় মেনে বসে আছে, যদিও তাদের সেই আস্থা নিজের কোনো কল্পিত গ্রন্থের উপর হয় বা নিজের কোনো গুরু বা পীর পয়গাম্বরের উপরই হয়। প্রায়শঃ এই বিষয়ে নিজের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির ব্যবহার করা হয়নি আর বেদ তথা ঋষি-মুনীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করা হয়েছে, এইজন্য যার মনে যা এসেছে নিজেদের কল্পিত ঈশ্বর বানিয়ে নিজ-নিজ পূজা-পদ্ধতির প্রচলন করে দিয়েছে।

আজ কোনো ঈশ্বরবাদী এটা ভাবার চেষ্টাই করে না যে সৃষ্টি যখন সবার জন্য এক, তার বিজ্ঞান সবার জন্য এক সমান, সূর্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, অণু আর পরমাণু আদি সবকিছুর বিজ্ঞান সবার জন্য সমান, জন্তু বিজ্ঞান আর উদ্ভিদ বিজ্ঞানও সবার জন্য সমান, তাহলে এইসবের নির্মাতা সবার জন্য ভিন্ন-ভিন্ন কিভাবে হয়ে গেল? বস্তুতঃ এদের পূজা-পদ্ধতি এই বিষয়ে এদের কোনো শিক্ষা দেয় না। অন্যদিকে এই লোক-দেখানো পূজা-পদ্ধতি দেখে আর অনেক চিত্র-বিচিত্র ঈশ্বরের স্বরূপের সম্বন্ধ শুনেই বুদ্ধি দিয়ে চিন্তনশীল কিছু ব্যক্তি নাস্তিক হয়ে যায় আর নিরন্তর হয়ে যাচ্ছে। এমন ব্যক্তি মানুষকে স্বচ্ছন্দ ভোগ-বাদী পশু বানাচ্ছে আর মাত্র আস্থা এবং বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে ঈশ্বরবাদীরা

মানুষকে অন্ধবিশ্বাসের গভীর খাদের দিকে ধাক্কা দেয়।

এইজন্য মানুষের উচিত যে নিজ-নিজ পূজা-পদ্ধতির উপর গভীর ভাবে নিষ্পক্ষ সমীক্ষা করা আর এটা জানার চেষ্টা করা যে তাদের দ্বারা পূজিত ঈশ্বর কি সত্যিই সম্পূর্ণ সৃষ্টির স্বামী? নাকি তারা পদভ্রষ্ট হয়েছে? যদি তারা এই পরীক্ষা করে তাহলে তারা অবশ্যই এর সমুচিত উত্তর স্বয়ং পেয়ে যাবে।

ঈশ্বরের পূজা-পদ্ধতি আসলে এমন হওয়া উচিত, যারদ্বারা তাদের ঈশ্বরের স্বরূপ আর গুণ, কর্ম ও স্বভাবের বিধিবত্ জ্ঞান হতে পারে। এমন হলে তাদের সৃষ্টিরও বোধ হবে আর সৃষ্টির মধ্যে থাকা অন্য প্রাণীদের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ আছে, এটাও বোধ হবে আর তদনুকুলই তাদের সবার সঙ্গে প্রীতি আর ন্যায়পূর্বক ব্যবহার করবে। এই সংসারের মধ্যে আদিকাল থেকেই বেদোক্ত য়োগ-সাধনার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, যাকে মহাভারত অথবা তার কিছু পূর্বে মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর য়োগদর্শনে সূত্রবদ্ধ করেছেন। এই পদ্ধতি মানুষকে আসল মানুষ তৈরি করে। এটা না কেবল মানব জাতি, অপিতু প্রাণীমাত্রের কল্যাণ করার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষকে মোক্ষ পর্যন্ত নিয়ে যায়। অন্য যেকোনো বৈদিক পদ্ধতি যা কখনো প্রচলিত ছিল, সেইসব মূলতঃ এরই স্বরূপ আর উদ্দেশ্য ছিল। কিছু কাল পূর্বে আর্যসমাজের সংস্থাপন ঋষি দয়ানন্দ যে বৈদিক সন্ধ্যা পদ্ধতির প্রণয়ন করে ছিলেন, তার উদ্দেশ্য ও স্বরূপও সেটাই। দুর্ভাগ্যবশত এই পদ্ধতিতে চলা ব্যক্তিও এই সন্ধ্যা-পদ্ধতির রহস্যকে বোঝেনি আর তোতা-পাখির মতো মন্ত্রপাঠ করাকেই নিজের কর্তব্য বলে মনে করেছে। এই কারণেই এই পদ্ধতিতে চলা ব্যক্তিদের অহংকার, ক্রোধ, কর্কশতা আর ঈর্ষা-দ্বেষের মতো অনেক দূর্গুণ গ্রস্থ দেখা যায়।

এইজন্য আমি ঋষি দয়ানন্দ নির্দিষ্ট বৈদিক সন্ধ্যার ব্যাখ্যা করা আবশ্যক

মনে করেছি। সাধক এটা পড়লে ঈশ্বর আর তাঁর সৃষ্টি-ক্রিয়াবিজ্ঞানের সম্যক্ বোধ হওয়ার সঙ্গে ঈশ্বরের উপর শ্রদ্ধা বাড়বে আর সমাজে তাদের ব্যবহারও মৃদু আর সৌম্য হবে। এই পুস্তক না কেবল আর্যসমাজী, অপিতু মানব মাত্রকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে সহায়ক হবে। এই পুস্তক সাধকের জীবনকে পবিত্র করে তাদের য়োগমার্গের সত্য পথিক বানাতে সহায়ক হবে।

এই পুস্তকের সম্পাদন আমার মানস-পুত্র প্রিয় বিশাল আর্য এবং তার ধর্মপত্নী মধুলিকা আর্যা উভয়জন কুশলতাপূর্বক করেছে। তারা না কেবল সম্পাদন করেছে, অপিতু মনসা-পরিক্রমার অন্তিম দুটো মন্ত্রের তিন প্রকারের ভাষ্য তথা নমস্কার মন্ত্রের আধিভৌতিক আর আধ্যাত্মিক ভাষ্যও করেছে। এটা আমার জন্য অতি প্রসন্নতার বিষয়। তারা দুইজনই এই সংস্থার ভবিষৎ, এইজন্য তাদের এই ক্ষেত্রে প্রগতি দেখে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। ঈশ্বর এই দুইজনের স্বাস্থ্য, সুখী আর তাদের উদ্দেশ্যে সফল করুক।

এমনিতে তো সন্ধ্যার ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক উত্তম প্রকারের পুস্তক আগে থেকেই বিদ্যমান আছে, তবুও এই পুস্তকের মধ্যে পাঠকরা এক নতুন দৃষ্টি পাবে, এটা আমার বিশ্বাস। পুস্তকের উপযোগিতা এবং বিশেষত্বকে তো আধ্যাত্ম পিপাসু আর সুধী পাঠক স্বয়ংই অনুভব করতে পারবেন, কিমধিকম্।

– আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক

* * * * *

বৈদিক-সন্ধ্যা

গায়ত্রী-মন্ত্রঃ

ওম্ ভূর্ভুব॒ঃ স্ব॑ঃ । তত্স॑বি॒তুর্বরে॑ণ্য॒ম্ ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ ধীমহি ।
ধিয়ো॒ য়ো নঃ॑ প্রচো॒দয়া॑ত্ ।। (য়জুর্বেদ ৩৬/৩)

আচমন-মন্ত্রঃ

ওম্ শন্নো॑ দে॒বীর॒ভিষ্ট॑য়॒S আপো॑ ভবন্তু পী॒তয়ে॑ ।
শংয়োর॒ভি স্র॑বন্তু নঃ ।। (য়জুর্বেদ ৩৬/১২)

অঙ্গস্পর্শ-মন্ত্রাঃ

ওম্ বাক্ বাক্ । ওম্ প্রাণঃ প্রাণঃ । ওম্ চক্ষুশ্চক্ষুঃ ।
ওম্ শ্রোত্রম্ শ্রোত্রম্ । ওম্ নাভিঃ । ওম্ হৃদয়ম্ । ওম্ কণ্ঠঃ । ওম্ শিরঃ ।
ওম্ বাহুভ্যাম্ য়শোবলম্ । ওম্ করতলকরপৃষ্ঠে ।

মার্জন-মন্ত্রাঃ

ওম্ ভূঃ পুনাতু শিরসি । ওম্ ভুবঃ পুনাতু নেত্রয়োঃ ।
ওম্ স্বঃ পুনাতু কণ্ঠে । ওম্ মহঃ পুনাতু হৃদয়ে ।
ওম্ জনঃ পুনাতু নাভ্যাম্ । ওম্ তপঃ পুনাতু পাদয়োঃ ।
ওম্ সত্যম্ পুনাতু পুনশ্শিরসি । ওম্ খম্ ব্রহ্ম পুনাতু সর্বত্র ।

প্রাণায়াম-মন্ত্রাঃ

ওম্ ভূঃ । ওম্ ভুবঃ । ওম্ মহঃ । ওম্ জনঃ । ওম্ তপঃ । ওম্ সত্যম্ ।

অঘমর্ষণ-মন্ত্রাঃ

ওম্ ঋতম্ চ সত্যম্ চাভীদ্ধাত্তপসোऽধ্যজায়ত ।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥ (ঋগ্বেদ ১০/১৯০/১)

ওম্ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বত্সরো অজায়ত ।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥ (ঋগ্বেদ ১০/১৯০/২)

ওম্ সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ত্ ।
দিবম্ চ পৃথিবীম্ চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥ (ঋগ্বেদ ১০/১৯০/৩)

আচমন-মন্ত্রঃ

ওম্ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ऽ আপো ভবন্তু পীতয়ে ।
শম্যোরভি স্রবন্তু নঃ ॥ (য়জুর্বেদ ৩৬/১২)

মনসা-পরিক্রমা-মন্ত্রাঃ

ওম্ প্রাচী দিগগ্নিরধিপতিরসিতো রক্ষিতাদিত্যা ইষবঃ । তেভ্যো
নমোऽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু ।
য়োऽস্মান্দ্বেষ্টি য়ম্ বয়ম্ দ্বিষ্মস্তম্ বো জম্ভে দধ্মঃ ॥ (অথর্ববেদ ৩/২৭/১)

ওম্ দক্ষিণা দিগিন্দ্রোऽধিপতিস্তিরশ্চিরাজী রক্ষিতা পিতর ইষবঃ ।তেভ্যো
নমোऽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু ।
য়োऽস্মান্দ্বেষ্টি য়ম্ বয়ম্ দ্বিষ্মস্তম্ বো জম্ভে দধ্মঃ ॥ (অথর্ববেদ ৩/২৭/২)

ওম্ প্রতীচী দিগ্বরুণোঽধিপতিঃ পৃদাকূ রক্ষিতান্নমিষবঃ। তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। য়োঽস্মান্দ্বেষ্টি য়ম্ বয়ম্ দ্বিষ্মস্তম্ বো জম্ভে দধ্মঃ ॥ (অথর্ববেদ ৩/২৭/৩)

ওম্ উদীচী দিক্সোমোঽধিপতিঃ স্বজো রক্ষিতাশনিরিষবঃ। তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। য়োঽস্মান্দ্বেষ্টি য়ম্ বয়ম্ দ্বিষ্মস্তম্ বো জম্ভে দধ্মঃ ॥ (অথর্ববেদ ৩/২৭/৪)

ওম্ ধ্রুবা দিগ্বিষ্ণুরধিপতিঃ কল্মাষগ্রীবো রক্ষিতা বীরুধ ইষবঃ। তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। য়োঽস্মান্দ্বেষ্টি য়ম্ বয়ম্ দ্বিষ্মস্তম্ বো জম্ভে দধ্মঃ ॥ (অথর্ববেদ ৩/২৭/৫)

ওম্ ঊর্ধ্বা দিগ্বৃহস্পতিরধিপতিঃ শ্বিত্রো রক্ষিতা বর্ষমিষবঃ। তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। য়োঽস্মান্দ্বেষ্টি য়ম্ বয়ম্ দ্বিষ্মস্তম্ বো জম্ভে দধ্মঃ ॥ (অথর্ববেদ ৩/২৭/৬)

উপস্থান-মন্ত্রাঃ

ওম্ উদ্বয়ম্ তমসস্পরি স্বঃ পশ্যন্ত S উত্তরম্।
দেবম্ দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ (য়জুর্বেদ ৩৫/১৪)

ওম্ উদু ত্যম্ জাতবেদসম্ দেবম্ বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ॥ (য়জুর্বেদ ৩৩/৩১)

ওম্ চিত্রম্ দেবানামুদগাদনীকম্ চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী S অন্তরিক্ষম্ সূর্য্য S আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ স্বাহা ॥
(য়জুর্বেদ ৭/৪২)

ওম্ তচ্চক্ষুর্দেবহিতম্ পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরত্। পশ্যেম শরদঃ শতম্ জীবেম শরদঃ শতম্ শৃণুয়াম শরদঃ শতম্ প্র ব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতম্ ভূয়শ্চ শরদঃ শতাত্ ॥ (য়জুর্বেদ ৩৬/২৪)

গায়ত্রী-মন্ত্রঃ

ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তত্সবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াত্ ॥ (য়জুর্বেদ ৩৬/৩)

সমর্পণম্

হে ঈশ্বর দয়ানিধে ! ভবত্কৃপয়াSনেন জপোপাসনাদিকর্মণা
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাম্ সদ্যঃ সিদ্ধির্ভবেন্নঃ।

নমস্কার-মন্ত্রঃ

ওম্ নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ
শিবায় চ শিবতরায় চ ॥ (য়জুর্বেদ ১৬/৪১)

ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ওঽম্

বৈদিক সন্ধ্যা (ব্রহ্মযজ্ঞ)

(আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক ভাষ্য)

সাধক সর্বদা সন্ধ্যা বা সাধনার জন্য উপযুক্ত, শান্ত আর সাত্ত্বিক স্থানের চয়ন করবে। স্থানের অভাবে নিজের গৃহের কোনো কোণাকেই সাধনার জন্য বেছে নিবে। সন্ধ্যা শুরু করার পূর্বে সাধক এমন ভাব করবে যেন সে নিজের প্রিয় প্রভু, যিনি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র স্বামী, তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্য বসেছে। ভক্তিপূর্ণ ভজন আদি গেয়ে মনকে ভক্তিময় বানানোর চেষ্টা করবে। তারপর সাধক ব্যাহৃতিপূর্বক গায়ত্রী মন্ত্রের উপর চিন্তন করবে। গায়ত্রী মন্ত্রের মহিমার বিষয়ে ভগবান মনুর কথন হল –

সাবিত্রীম্ চ জপেন্নিত্যম্ পবিত্রাণি চ শক্তিতঃ।
সর্বেষ্বেব ব্রতেষ্বেবম্ প্রায়শ্চিত্তার্থমাদৃতঃ॥ [মনুঃ ১১.২২৫]

এতদক্ষরমেতাম্ চ জপন্ব্যাহৃতিপূর্বিকাম্।
সন্ধ্যয়োর্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন য়ুজ্যতে॥ [মনুঃ ২.৫৩]

এই দুই শ্লোকের দ্বারা গায়ত্রী মন্ত্রের নামে প্রসিদ্ধ সাবিত্রী মন্ত্রের মহিমার বোধ হয়। এই মন্ত্রটা হল এইরকম –

গায়ত্রী-মন্ত্রঃ

ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ । তত্সবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি ।
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াত্ ॥ [য়জুর্বেদ ৩৬.৩]

এই মন্ত্র (ব্যাহৃতি রহিত রূপে) য়জুর্বেদ ৩.৩৫, ২২.৯, ৩০.২; ঋগ্বেদ ৩. ৬২.১০; সামবেদ ১৪.৬২ মধ্যেও বিদ্যমান আছে। এটা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মধ্যেও অনেকত্র আছে। এরমধ্যে য়জুর্বেদ ৩০.২ এই মন্ত্রের ঋষি নারায়ণ তথা অন্যত্র বিশ্বামিত্র আছে। দেবতা সবিতা, ছন্দ নিচৃদ্ বৃহতী স্বর ষডজ আছে। ব্যাহৃতির ছন্দ দৈবী বৃহতী তথা স্বর ব্যাহৃতি সহিত সম্পূর্ণ মন্ত্রের স্বর মধ্যম ষডজ আছে। মহর্ষি দয়ানন্দ সর্বত্র এর ভাষ্য আধ্যাত্মিক করেছেন। কেবল য়জুর্বেদ ৩০.২ মন্ত্রের ভাবার্থে আধিভৌতিকের অল্প সংকেত আছে, বাকিটা আধ্যাত্মিক ভাষ্যই আছে। এক বিদ্বান আমাকে একসময় বলেছিলেন যে গায়ত্রী মন্ত্রের মতো কিছু মন্ত্রের আধ্যাত্মিকের অতিরিক্ত অন্য কোনো প্রকারের ভাষ্য হতেই পারে না। আমি সংসারের সকল বেদজ্ঞগণকে ঘোষণাপূর্বক বলতে চাইবো যে বেদের প্রত্যেকটা মন্ত্র এই সম্পূর্ণ সৃষ্টির মধ্যে অনেকত্র কম্পনরূপে বিদ্যমান আছে। এইসব মন্ত্রের এই রূপে উৎপত্তি পৃথিব্যাদি লোকের উৎপত্তির থেকেও পূর্বে হয়েছিল। এই কারণে প্রত্যেক মন্ত্রের আধিদৈবিক ভাষ্য অবশ্যই আছে। ত্রিবিধ অর্থ প্রক্রিয়াতে সর্বাধিক আর সর্বপ্রথম সম্ভাবনা এই প্রকারের অর্থেরই হয়। এইজন্য এই মন্ত্রের আধিদৈবিক অর্থ হতে পারে না, এমন বিচার করা বেদের যথার্থ স্বরূপ হতে নিতান্ত অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক হবে।

এই ঋচার দেবতা হল সবিতা। সবিতার বিষয়ে ঋষিদের কথন হল –

[**সবিতা** = সবিতা সর্বস্য প্রসবিতা (নিরুক্ত ১০.৩১), সবিতা বৈ দেবানাম্ প্রসবিতা (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.১.২.১৭), সবিতা বৈ প্রসবানামীশে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১.৩০), প্রজাপতির্বৈ সবিতা (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১১.৫.১৭), মনো বৈ সবিতা (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.৩.১.১৩), বিদ্যুদেব সবিতা (গোপথ ব্রাহ্মণ পূর্বভাগ ১.৩৩), পশবো বৈ সবিতা (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.২.৩.১১), প্রাণো বৈ সবিতা (ঐতরেয়

ব্রাহ্মণ ১.১৯), বেদা এব সবিতা (গোপথ ব্রাহ্মণ পূর্বভাগ ১.৩৩), সবিতা রাষ্ট্রম্ রাষ্ট্রপতিঃ (তৈত্তেরীয় ব্রাহ্মণ ২.৫.৭.৪)]

এরদ্বারা নিম্নলিখিত নিষ্কর্ষ প্রাপ্ত হয় –

- সবিতা নামক পদার্থ হল সবার উৎপত্তি আর প্রেরণার স্রোত বা সাধন।
- এটা সব প্রকাশিত আর কামনা অর্থাৎ আকর্ষণাদি বল যুক্ত কণার উৎপাদক আর প্রেরক।
- এটা সব উৎপন্ন পদার্থের নিয়ন্ত্রক।
- 'ওম্' রশ্মি রূপ ছন্দ রশ্মি এবং মনস্তত্ত্বই হল সবিতা।
- বিদ্যুৎকেও 'সবিতা' বলে।
- বিভিন্ন মরুদ্ রশ্মি এবং দৃশ্য কণাকে 'সবিতা' বলে।
- বিভিন্ন প্রাণ রশ্মিকে 'সবিতা' বলে।
- সব ছন্দ রশ্মি 'সবিতা' হয়।
- তারার কেন্দ্রীয় ভাগ রূপ রাষ্ট্রকে প্রকাশিত এবং সেগুলোর পালনকারী সম্পূর্ণ তারাকেও 'সবিতা' বলে।

এটা আমি পূর্বেই লিখেছি যে দেবতা যেকোনো মন্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হয়। এই কারণে এই মন্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য হল 'ওম্' ছন্দ রশ্মি, মনস্তত্ত্ব, প্রাণ তত্ত্ব এবং সব ছন্দ রশ্মি। এই ঋচার উৎপত্তি বিশ্বামিত্র ঋষি [বাগ্ বৈ বিশ্বামিত্রঃ (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১০.৫), সর্বমিত্রঃ (নিরুক্ত ২.২৪)] অর্থাৎ সবাইকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম 'ওম্' ছন্দ রশ্মির দ্বারা হয়।

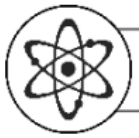

আধিদৈবিক ভাষ্য

(**ভূঃ**) 'ভূঃ' নামক ছন্দ রশ্মি কিংবা অপ্রকাশিত কণা বা লোক, (**ভুবঃ**)

‘ভুবঃ’ নামক রশ্মি কিংবা আকাশ তত্ত্ব, (**স্বঃ**) ‘সুবঃ’ নামক রশ্মি কিংবা প্রকাশিত কণা, ফোটন বা সূর্যাদি তারা আদিতে ব্যাপ্ত, (**তত্, সবিতুঃ**) সেই অগোচর বা দূরস্থ সবিতা অর্থাৎ মন, ‘ওম্’ রশ্মি, সব ছন্দ রশ্মি, বিদ্যুৎ সূর্যাদি আদি পদার্থকে (**বরেণ্যম্, ভর্গঃ, দেবস্য**) সর্বতঃ আচ্ছাদনকারী ব্যাপক [**ভর্গঃ** = অগ্নির্বৈ ভর্গঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১২.৩.৪.৮), আদিত্যো বৈ ভর্গঃ (জৈমিনীয়োপনিষদ ব্রাহ্মণ ৪.১২.২.২), বীর্যম্ বৈ ভর্গঽএষ বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৫.৪.৫.১), অয়ম্ বৈ (পৃথিবী) লোকো ভর্গঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১২.৩.৪.৭)] আগ্নেয় তেজ, যা সম্পূর্ণ পদার্থকে ব্যাপ্ত করে অনেক সমন্বয়কারী আর সংকোচকারী বল দ্বারা যুক্ত হয়ে প্রকাশিত আর অপ্রকাশিত লোকের নির্মাণ হেতু প্রেরিত করতে সক্ষম হয়, (**ধীমহি**) প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেই সম্পূর্ণ পদার্থ সেই আগ্নেয় তেজ, বল আদিকে ব্যাপক রূপে ধারণ করে। (**ধিয়ঃ, য়ঃ, নঃ, প্রচোদয়াত্**) যখন সেই উপরোক্ত আগ্নেয় তেজ সেই পদার্থকে ব্যাপ্ত করে নেয়, তখন বিশ্বামিত্র ঋষি সংজ্ঞক মন আর ‘ওম্’ রশ্মি রূপ পদার্থ [**ধীঃ** = কর্মনাম (নিঘন্টু ২.১), প্রজ্ঞানাম (নিঘন্টু. ৩.৯), বাগ্ বৈ ধীঃ (ঐতরেয় আরণ্যক ১.১.৪)] নানা প্রকারের বাগ্ রশ্মিকে বিবিধ দীপ্তি আর ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে ভালো ভাবে প্রেরিত আর নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে।

ভাবার্থ –

মন এবং ‘ওম্’ রশ্মি ব্যাহৃতি রশ্মির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রমশঃ সব মরুদ্, ছন্দ আদি রশ্মিকে অনুকূলতার সঙ্গে সক্রিয় করে সব কণা, কোয়ান্টা এবং আকাশ তত্ত্বকে উচিত বল আর নিয়ন্ত্রণযুক্ত করে। এরফলে সব লোক তথা অন্তরীক্ষের মধ্যে বিদ্যমান পদার্থ নিয়ন্ত্রিত উর্জাযুক্ত হয়ে নিজ-নিজ ক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। এরফলে বিদ্যুৎ বলও ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকে।

সৃষ্টিতে এই ঋচার প্রভাব –

এই ঋচা উৎপত্তির পূর্বে বিশ্বামিত্র ঋষি অর্থাৎ 'ওম্' ছন্দ রশ্মি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়। এর ছন্দ দৈবী বৃহতী+নিচৃদ্ গায়ত্রী হওয়াতে এর ছান্দস প্রভাবে বিভিন্ন প্রকাশিত কণা বা রশ্মি আদি পদার্থ তীক্ষ্ণ তেজ আর বল প্রাপ্ত করে সংকুচিত হতে থাকে। এর দৈবত প্রভাবে মনস্তত্ত্ব এবং 'ওম্' ছন্দ রশ্মি রূপ সূক্ষ্মতম পদার্থ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণ, মরুত্, ছন্দ রশ্মি, বিদ্যুতের সঙ্গে-সঙ্গে সব দৃশ্য কণা বা কোয়ান্টা প্রভাবিত অর্থাৎ সক্রিয় হয়। এই প্রক্রিয়াতে 'ভূঃ', 'ভুবঃ' এবং 'সুবঃ' নামক সূক্ষ্ম ছন্দ রশ্মি 'ওম্' ছন্দ রশ্মির দ্বারা বিশেষ ভাবে উপযুক্ত আর প্রেরিত হয়ে কণা, কোয়ান্টা, আকাশ তত্ত্বকে পর্যন্ত প্রভাবিত করে। এরফলে এগুলোর মধ্যে বল আর ঊর্জার বৃদ্ধি হয়ে সব পদার্থ বিশেষ সক্রিয়তা প্রাপ্ত করে। এইসময় হওয়া সব ক্রিয়ার মধ্যে যে-যে ছন্দ রশ্মি নিজের ভূমিকা পালন করে, সেইসব বিশেষ ভাবে উত্তেজিত হয়ে বিভিন্ন কর্মকে সমৃদ্ধ করে। বিভিন্ন লোক, তা সেটা তারা আদি প্রকাশিত লোক হোক অথবা পৃথিব্যাদি অপ্রকাশিত লোক হোক, সবার রচনার সময় এই ছন্দ রশ্মি নিজের ভূমিকা পালন করে। এর প্রভাবে সম্পূর্ণ পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎ এবং ঊষ্মার বৃদ্ধি হয়, কিন্তু এই স্থিতিতেও এই ছন্দ রশ্মি বিভিন্ন কণা বা কোয়ান্টাকে সক্রিয়তা প্রদান করেও অনুকূলতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত রাখতে সহায়ক হয়। তবে হ্যাঁ, সেখানে ব্যাহৃতির অবিদ্যমানতা অবশ্য আছে। এর ষড়জ স্বরের প্রভাবে এই রশ্মি অন্য সব রশ্মিকে আশ্রয় দিতে, নিয়ন্ত্রণ করতে, চাপ এবং বহন করতে সহায়ক হয়। ব্যাহৃতির মধ্যম স্বর এর বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে নিজের ভূমিকা পালনের সংকেত দেয়। ছন্দ আর স্বরের প্রভাব হেতু পূর্বোক্ত ছন্দ প্রকরণকে পড়া অনিবার্য।

আধ্যাত্মিক ভাষ্য

(**ভূঃ**) প্রাণের থেকেও প্রিয় আর সবার প্রাণের আধার, ভূলোক অর্থাৎ সব অপ্রকাশিত লোকের স্বামী এবং সৎ স্বরূপ পরমাত্মন্! (**ভুবঃ**) অপানস্বরূপ অর্থাৎ সব দুর্গুণ আর দুঃখ নাশক চেতনস্বরূপ পরমেশ্বর! (**স্বঃ**) ব্যানস্বরূপ অর্থাৎ সম্পূর্ণ জগৎকে বিভিন্নভাবে সঞ্চালনকারী সকল প্রকাশিত লোকসমূহের স্বামী, আনন্দস্বরূপ আর সবাইকে আনন্দ প্রদানকারী জগদীশ্বর! (**সবিতুঃ**) সকল জগৎকে উৎপন্নকারী, সবাইকে শুভ কর্মের প্রেরণা প্রদানকারী, সকল লোকের ধারণকারী পরমাত্মার (**দেবস্য**) সব দিব্যগুণযুক্ত, সব প্রকাশিত লোকসমূহেরও প্রকাশক, সব মানুষকে বেদজ্ঞান প্রদানকারী, সকল সৃষ্টির নিয়ন্তা, সবার কামনার যোগ্য, প্রলয়কালে সকলকে নিদ্রারূপ অবস্থা প্রদানকারী দেবস্বরূপ পরমাত্মার (**তত্, বরেণ্যম্**) সেই বরণযোগ্য সর্বশ্রেষ্ঠ (**ভর্গঃ**) পাপনাশক তেজকে (**ধীমহি**) আমরা নিজের অন্তঃকরণ বা আত্মার মধ্যে ধারণ করবো। (**য়ঃ, নঃ, ধিয়ঃ**) যিনি অর্থাৎ সেই তেজ [**ধীঃ** = প্রজ্ঞানাম (নিঘন্টু. ৩.৯), কর্মনাম (নিঘন্টু. ২.১)] আমাদের বুদ্ধি এবং কর্মকে (**প্রচোদয়াত্**) উত্তম প্রকারে প্রেরিত করে অর্থাৎ সেই ঈশ্বর আমাদের সত্ পথে চলার জন্য প্রেরিত করেন আর আমরা সেই প্রেরণার অনুসরণ করে সত্ পথে চলার সামর্থ্য প্রাপ্ত করবো আর সেই পথে সর্বদা চলতেও থাকবো।

এই মন্ত্রকে উপাসনার জন্য সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ এরমধ্যে পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা এই তিনেরই সমাবেশ আছে। 'ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, সবিতুঃ, দেবস্য, বরেণ্যম্, ভর্গঃ' পদ পরমেশ্বরের গুণের প্রতি-পাদন করে, এই কারণে এইসব পদ স্তুতি পরক হয়। এইসব গুণের কীর্তন দ্বারা

সাধকের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব উৎপন্ন হয়। সব ব্যাহৃতির চিন্তন দ্বারা সেই সাধক সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঈশ্বরেরই অনুভব করতে থাকে। সে তাঁকে দুঃখবিনাশক সুখ প্রদাতা মেনে সাংসারিক দুঃখ ভুলে আনন্দের অনুভূতি করতে থাকে। ঈশ্বরকে সে সকল সৃষ্টির উৎপাদক আর নিয়ন্ত্রক মেনে স্বত্বের অহংকার থেকে মুক্ত হতে থাকে। সে সেই ঈশ্বরকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মেনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কামনা করতে থাকে। তাঁর পাপনাশক স্বরূপকে স্মরণ করে সাধক নিজের অন্তঃকরণের মলিনতা দূর হয়ে যাওয়ার অনুভব করে। এখানে 'ধীমহি' পদ তাঁর উপাসনার সংকেত করে। এই পদের উপর বিচার করার সময় সেই সাধক এমন পরমাত্মার তেজকে নিজের হৃদয়ে অনুভব করে 'ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াত্' এই প্রার্থনাপরক পদের জপ দ্বারা পবিত্র বুদ্ধি প্রদান করার আর তদনুকূল কর্ম করার সামর্থ প্রাপ্ত করার প্রার্থনা করে আর এই প্রার্থনার দ্বারা সেই ঈশ্বরের প্রতি সে পূর্ণ সমর্পিত হয়ে সর্বদা অহংকারশূন্য হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে।

আধিদৈবিক ভাষ্য এবং বৈজ্ঞানিক প্রভাবকে দর্শানোর পশ্চাৎ আমরা এখন এই মন্ত্রের আধিভৌতিক অর্থের উপর বিচার করবো –

আধিভৌতিক ভাষ্য

[**ভূঃ** = কর্মবিদ্যাম্, **ভুবঃ** = উপাসনাবিদ্যাম্, **স্বঃ** = জ্ঞানবিদ্যাম্ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ৩৬.৩)। **সবিতা** = য়োগপদার্থজ্ঞানস্য প্রসবিতা (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১১.৩), সবিতা রাষ্ট্রম্ রাষ্ট্রপতিঃ (তৈত্তেরীয় ব্রাহ্মণ ২.৫.৭.৪)] কর্মবিদ্যা, উপাসনাবিদ্যা এবং জ্ঞানবিদ্যা এই তিন বিদ্যা সম্পন্ন (**সবিতুঃ**) (**দেবস্য**) দিব্য গুণযুক্ত রাজা, মাতা-পিতা কিংবা উপদেশক, আচার্য অথবা

য়োগী পুরুষের (**বরেণ্যম্**) স্বীকরণীয় শ্রেষ্ঠ, (**ভর্গঃ**) পাপাদি দোষের নাশকারী, সমাজ, রাষ্ট্র আর বিশ্বের মধ্যে যজ্ঞ অর্থাৎ সংগঠন, ত্যাগ, বলিদানের ভাবনাকে সমৃদ্ধকারী উপদেশ বা বিধানকে (**ধীমহি**) আমরা সবাই ধারণ করবো। (**য়ঃ**) এইরূপ যে রাজা, য়োগী, আচার্য বা মাতা-পিতা আর তাদের বিধান বা উপদেশ (**নঃ**) আমাদের (**ধিয়ঃ**) কর্ম এবং বুদ্ধিকে (**প্রচোদয়াত্**) ব্যক্তিগত, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা বৈশ্বিক উন্নতির পথে উত্তম প্রকারে প্রেরিত করে।

ভাবার্থ –

উত্তম য়োগী এবং বিজ্ঞানী মাতা-পিতা, আচার্য এবং রাজা নিজের সন্তান, শিষ্য বা প্রজাকে নিজের শ্রেষ্ঠ উপদেশ এবং সর্বহিতকারী বিধানের দ্বারা সকল প্রকারের দুঃখ, পাপ থেকে মুক্ত করে উত্তম মার্গে নিয়ে যায়। এইরূপ মাতা-পিতা, আচার্য এবং রাজার প্রতি সন্তান, শিষ্য এবং প্রজা অতি শ্রদ্ধাভাব রাখবে, যাতে সম্পূর্ণ পরিবার, রাষ্ট্র বা বিশ্ব সর্ববিধ সুখী হতে পারে।

গায়ত্রী মন্ত্রের সাধনা এবং সন্ধ্যাকারী সাধকের উচিত যে সে স্বয়ং নিজের বুদ্ধি আর কর্মকে পবিত্র করার পুরুষার্থের পাশাপাশি পরিবার, সমাজ আর রাষ্ট্র থেকে সব তমগুণী প্রবৃত্তিকে দূর করার নিরন্তর চেষ্টা করবে। এইজন্য সর্বদা বুদ্ধিবর্ধক সাত্ত্বিক ভোজনই করবে।

আচমন-মন্ত্রঃ

ওম্ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ऽ আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শংয়োরভি স্রবন্তু নঃ ॥ [য়জুর্বেদ ৩৬.১২]

এই মন্ত্রের ঋষি হল দধ্যঙ্, যা অথর্বা থেকে উৎপন্ন। এর বিষয়ে ঋষিরা

লিখেছেন – ‘বাগ্বৈ দধ্যঙাথর্বণঃ’ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.৪.২.৩), ‘বাগ্বা অনুষ্টুপ্’ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১.২৮), এর অর্থ হল এই ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি কিছু বিশেষ প্রকারের অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মি থেকে হয়েছে। ‘আপঃ’ হল এর দেবতা।

[**আপঃ** = মেধ্যা বা আপঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.১.১.১), অন্নম্ বাऽআপঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.১.১.৩), বজ্রো বা ऽআপঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.১.১.১৭), আপো হি য়জ্ঞঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.১.৪.১৫), পশবো বা এতে য়দাপঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১.৮), দেবীঃ = প্রাণো বা অপানোব্যানস্তিস্রো দেব্যঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.৪)]

এর ছন্দ হল গায়ত্রী, এই কারণে এর দৈবত এবং ছান্দস প্রভাব দ্বারা আকাশে বিদ্যমান বিভিন্ন সংযোজ্য কণা, ছন্দ বা মরুদ্ রশ্মি এবং বজ্র রশ্মি আদি পদার্থ, যা দেবীসংজ্ঞক প্রাণ, অপান আর ব্যান দ্বারা সংযুক্ত হয়, শ্বেতবর্ণীয় তেজযুক্ত হতে থাকে তথা বিদ্যুৎ বলের বৃদ্ধি হতে থাকে।

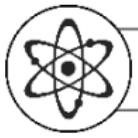

আধিদৈবিক ভাষ্য

(**শম্, নঃ, দেবীঃ, অভিষ্টয়ে, আপঃ, ভবন্তু, পীতয়ে**) প্রাণ, অপান আর ব্যানের মধ্যে বিদ্যমান কণা বা রশ্মি এই ছন্দ রশ্মির ঋষি রশ্মির সঙ্গে সবদিক দিয়ে সঙ্গত হয়ে পরস্পর অবশোষিত করার জন্য সুষম ঊর্জাযুক্ত হয়। এর অর্থ হল সেইসব কণা বা রশ্মি না তো অধিক বিক্ষুব্ধ হয় আর না শিথিল হয়, বরং সেগুলো সুষম ঊর্জাযুক্ত হয়। এইজন্য সেই কণা বা রশ্মির সংযোগ-প্রক্রিয়া সমৃদ্ধ হতে থাকে। এইসব সংযোজ্য কণা পরস্পর ক্রীড়া করতে-করতে চকমক করে একে-অপরের প্রতি বিভিন্ন ক্রীড়া করে আকর্ষণাদি যুক্ত হয়। যখন এইসব গুণ সুষম অবস্থা প্রাপ্ত করে, তখনই সেগুলো য়জনীয় কর্মে সক্ষম হয়। এখানে ‘আপঃ’ পদের ভাব ‘দেবীঃ’ দর্শাচ্ছে।

এখানে ‘অভিষ্টয়ে’ পদের মধ্যে ‘ঈকার’-কে ‘ইকার’ ছান্দসের প্রয়োগ আছে। এই পদ এটাই দশায় যে কণার সংযোগ প্রক্রিয়া সর্বদা সম্মুখে উপস্থিত অথবা সম্মুখে গতি করা কণার মাঝে হয়। একইসঙ্গে ‘অভি’ উপসর্গের প্রয়োগ ‘সব দিকে’ অর্থতেও হয়। এরদ্বারা এটাও স্পষ্ট হয় যে য়জনের এই প্রক্রিয়া সর্বত্রই হয়। এখানে ‘পীতয়ে’ পদের প্রয়োগ এই দর্শায় যে এইসব সংযোগ প্রক্রিয়াকে সুরক্ষিত করার জন্য উর্জার সুষম হওয়াটা অনিবার্য, অন্যথা সংযুক্ত কণা উৎপন্ন হতেই বিখণ্ডিত হতে পারে।

(**শম্যোঃ**, **অভি**, **স্রবন্তু**, **নঃ**) [**শম্যোঃ** = শম্যুঃ সুখয়ুঃ। (নিরুক্ত ৪.২১), অথাপি শম্যুর্বার্হস্পত্য উচ্যতে। (নিরুক্ত ৪.২১), **বৃহস্পতিঃ** = এষ (প্রাণঃ) উ এব বৃহস্পতিঃ। (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪.৪.১.২২), অথ য়স্সোঽপান আসীত্ স বৃহস্পতিরভবত্। (জৈমিনীয়োপনিষদ ব্রাহ্মণ ২.২.৫), বৃহতাম্ পালকঃ সূত্রাত্মা। (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ৩৯.৬)]

এইসব ঋষি রশ্মিতে উপস্থিত বা বিদ্যমান বিভিন্ন কণার উপর প্রাণ, অপান এবং সূত্রাত্মা বায়ু এই তিন রশ্মির মিশ্রিত রূপ দ্বারা উৎপন্ন বিশেষ প্রকারের রশ্মির বৃষ্টি সব দিক থেকে হতে থাকে। এই কারণে সেইসব সংযোজ্য কণা পারস্পরিক সংযোগ হেতু সুখদ স্থিতি প্রাপ্ত করে। [**সুখম্** = সুখম্ কস্মাত্? সুহিতম্ খেভ্যঃ। (নিরুক্ত ৩.১৩)] এখানে সুখদ স্থিতির অর্থ হল সেইসব সংযোজ্য কণা একে-অপরের পরিধিরূপে বিদ্যমান আকাশ তত্ত্বকে উচিত রীতিতে ধারণ করতে সক্ষম হয় বা হতে থাকে। এরফলে সৃষ্টির মধ্যে নানা প্রকারের য়জনীয় ক্রিয়া সমৃদ্ধ হতে থাকে।

ভাবার্থ –

এই গায়ত্রী ছন্দ রশ্মির কারণে যেকোনো সংযোজ্য কণা, ছন্দ, মরুদ্ এবং

বজ্র রশ্মি সংযোগের পূর্বে সুষম ঊর্জাযুক্ত হয় অর্থাৎ না বিক্ষুব্ধ হয় আর না শিথিল। একইসঙ্গে এই রশ্মি সংযোগের প্রক্রিয়াকে সুরক্ষিতও রাখে। সৃষ্টিতে যেখানেই সংযোগ হয়, সেখানে ভারসাম্যের এই প্রক্রিয়া অনিবার্যরূপে হয়।

বিভিন্ন সংযোজ্য কণার উপর প্রাণ, অপান আর সূত্রাত্মা বায়ু থেকে উৎপন্ন এক বিশেষ রশ্মির বৃষ্টি সবদিক থেকে হওয়ার কারণে সেগুলো নিজের চারি-দিকে বিদ্যমান আকাশ তত্ত্বকে ধারণ করতে সক্ষম হয়, যারফলে য়জনীয় ক্রিয়া সমৃদ্ধ হয়।

আধ্যাত্মিক ভাষ্য

(**দেবীঃ**, **আপঃ**) হে সকল দিব্য গুণযুক্ত আর সকলকে দিব্য গুণ প্রদান-কারী, সুখস্বরূপ আর সুখ প্রদানকারী, সম্পূর্ণ সৃষ্টির নির্মাতা আর নিয়ন্ত্রক, সকল মানুষকে জগতের বিভিন্ন ব্যবহারের শিক্ষা বেদ দ্বারা প্রদানকারী সর্বব্যাপক পরমেশ্বর! (**নঃ**, **অভিষ্টয়ে**, **পীতয়ে**) আমাদের অভীষ্টরূপ মোক্ষ সিদ্ধির জন্য এবং সকল দুর্গুণ আর দুঃখ আদি হতে আমাদের রক্ষার জন্য, পরমানন্দ পান করানোর জন্য (**শম্**, **ভবন্তু**) আপনি কল্যাণকারী হউন। (**নঃ**, **শম্যোঃ**, **অভি**, **স্রবন্তু**) হে পরমেশ্বর! আপনি আমাদের য়োগসাধনার উপর সব দিক থেকে নিরন্তর পরম সুখের বর্ষণ করুন। এখানে সুখের তাৎপর্য হল—'সুহিতম্ খেভ্যঃ' (নিরুক্ত ৩.১৩) অর্থাৎ আমাদের আত্মা, মন এবং ইন্দ্রিয়কে উত্তম প্রকারে ধারণ করে অর্থাৎ সেগুলো একাগ্র করে সমাধিকে প্রাপ্তকারী হোক।

ভাবার্থ—

হে দিব্য গুণযুক্ত সর্বব্যাপক পরমেশ্বর! দুর্গুণ আর দুঃখ আদি থেকে আমাদের রক্ষা করে মোক্ষ সিদ্ধির জন্য কল্যাণকারী হউন আর আমাদের

উপর পরম সুখের বর্ষণ করুন, যাতে আমাদের আত্মা সমাধিকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়।

আধিভৌতিক ভাষ্য

(**দেবীঃ**, **আপঃ**) দিব্যগুণে ব্যাপ্ত অর্থাৎ সকল দিব্যগুণ সম্পন্ন রাজা, আচার্য বা পিতরজন (**নঃ**) আমাদের (**অভিষ্টয়ে**) [এই পদ অভি পূর্বক 'য়জ দেবপূজা সম্গতিকরণদানেষু' ধাতু দ্বারা সিদ্ধ হয়েছে।] আমাদের অর্থাৎ প্রজাজন, শিষ্যগণ অথবা সন্তানকে দেবত্ব প্রদান করে তাদের কর্তব্যবোধ করানোর জন্য, তাদের পরস্পর একটা লক্ষ্য বানিয়ে সংগঠিত করার জন্য এবং এদের মধ্যে ত্যাগের ভাবনা উৎপন্ন করার জন্য (**পীতয়ে**) এদের দুর্গুণ, দুর্ব্যসন, দুঃখ আদি থেকে রক্ষা করার জন্য (**শম্**, **ভবন্তু**) [**শম্** = শম্ সুখনাম। (নিরুক্ত ৩.৬)] সুখকারী হবে, যাতে আমাদের প্রজাজন আদির উপর রাজা, আচার্য আদি (**শম্যোঃ**) শান্তি আর সুখের (**অভি**, **স্রবন্তু**) বর্ষণ সবদিক থেকে করবে, যারদ্বারা যেকোনো রাষ্ট্র, সমাজ বা পরিবার সবার মধ্যে সুখ আর শান্তির সাম্রাজ্য বজায় থাকে।

এখানে দেবী পদ 'দিবু ক্রীডাবিজিগীষাব্যবহারদ্যুতিস্তুতিমোদমদস্বপ্ন কান্তি গতিষু' ধাতু দ্বারা ব্যুত্পন্ন হয়েছে। মহর্ষি য়াস্ক 'দেবঃ' পদের ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন – 'দেবো দানাদ্বা, দীপনাদ্বা, দ্যোতনাদ্বা, দ্যুস্থানো ভবতীতি বা' (নিরুক্ত ৭.১৫)। এইসবের অর্থ হল – শান্তি আর সুখ প্রদানকারী রাজা, আচার্য বা পিতরজন তারাই হতে পারবে, যারা স্বয়ং ত্যাগী-তপস্বী, জিতেন্দ্রিয়, নিজের জ্ঞান আর সদ্ গুণ দ্বারা প্রকাশিত আর এরদ্বারা প্রজাজন আদিকেও প্রকাশিত করে, সবার জন্য কমনীয় ব্যবহার করে আর সর্বদা গতিশীল অর্থাৎ পুরুষার্থী হয়।

ভাবার্থ –

১. শান্তি আর সুখ প্রদানকারী, ত্যাগী, জ্ঞান আদি সদ্ গুণ দ্বারা প্রজাজন আদির প্রকাশক আর সবার জন্য কমনীয় রাজা প্রজাজনকে সংগঠিত করতে আর তাদের রক্ষাকারী হবে, যাতে প্রজার উপর সুখ আর শান্তির বৃষ্টি সবদিক থেকে হতে থাকে।

২. শিষ্যগণকে কর্তব্যবোধ করিয়ে তথা নিজের জ্ঞান আর সদ্ গুণ দ্বারা তাদের প্রকাশিত করে এইরূপ আচার্য নিজের শিষ্যের মধ্যে ত্যাগের ভাবনা উৎপন্ন করতে তথা তাদের দুর্গুণ, দুর্ব্যসন আদি থেকে রক্ষাকারী হবে, যাতে সমাজে সবদিকে সুখ শান্তি বজায় থাকে।

৩. জিতেন্দ্রিয় আর পুরুষার্থী পিতরজন নিজের সন্তানদের দেবত্ব প্রদান করে, তাদের তপস্বী বানিয়ে তাদের সব প্রকারের দুঃখ থেকে রক্ষাকারী হবে, যাতে পরিবারে সবদিক থেকে সুখ আর শান্তির বৃষ্টি হতে থাকে।

এই মন্ত্র থেকে সাধক এই শিক্ষা প্রাপ্ত করে যে সে সর্বদা নিজের উপর পরমাত্মার কৃপাদৃষ্টির অনুভব করে শান্ত আর প্রসন্নচিত্ত থাকার চেষ্টা করবে। একইসঙ্গে নিজের সম্পর্কে আসা মানুষের সঙ্গে শান্ত আর সৌম্য ব্যবহারই করবে তথা ক্রোধ আদিকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করবে।

বক্তব্য –

এই মন্ত্রের পরে তিনবার জল দিয়ে আচমণ করা হয়। জল হল শুদ্ধতা, শান্তি আর শীতলতার প্রতীক। এইভাবে জল দিয়ে আচমণের অর্থ হল আমরা শান্ত মনে এবং পবিত্র ভাব নিয়ে পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য প্রবৃত্ত হচ্ছি। ঋষি দয়ানন্দ আচমণের জন্য ততটুকুই জল ব্যবহারের কথা বলেছেন যেন সেটা হৃদয় ক্ষেত্র পর্যন্ত পৌছায়। এর অর্থ হল সেই পবিত্রতা আর শান্তির ভাবনা না

কেবল বাণী দ্বারা, অপিতু হৃদয় দ্বারা হবে। তিনবার আচমণের অর্থ হল আমরা এই আচমণ দ্বারা আধিদৈবিক, আধিভৌতিক আর আধ্যাত্মিক দুঃখ থেকে নিবৃত্তি তথা এই তিন প্রকারের সুখকে প্রাপ্ত করার জন্য প্রার্থনা করছি। এর পূর্বে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণের তাৎপর্য হল এই সব কিছুর জন্য আমরা সর্বপ্রথম পরমেশ্বরের কাছ থেকে উত্তম বুদ্ধির প্রার্থনা করি, কারণ প্রার্থনা বুদ্ধিপূর্বকই করা উচিত।

অঙ্গস্পর্শ-মন্ত্রাঃ

ওম্ বাক্ বাক্।

ওম্ প্রাণঃ প্রাণঃ।

ওম্ চক্ষুশ্চক্ষুঃ।

ওম্ শ্রোত্রম্ শ্রোত্রম্।

ওম্ নাভিঃ।

ওম্ হৃদয়ম্।

ওম্ কণ্ঠঃ।

ওম্ শিরঃ।

ওম্ বাহুভ্যাম্ য়শোবলম্ ।

ওম্ করতলকরপৃষ্ঠে।

সাধক যখন উপাসনাতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে পূর্ব মন্ত্র দ্বারা সবদিক থেকে আত্মিক সুখ আর পবিত্রতার বৃষ্টির অনুভব করে নিজের শরীরের অঙ্গের উপর ক্রমশঃ বিচার করে। এরমধ্যে সর্বপ্রথম বাক্ ইন্দ্রিয়ের উপর বিচার করা হয়েছে।

ওম্ বাক্ বাক্ ।

এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে বাক্ ইন্দ্রিয়ের গ্রহণই কেন সর্বপ্রথম করা হয়েছে? আমার দৃষ্টিতে এর কারণ হল সামাজিক প্রাণী মানুষ সবথেকে অধিক ব্যবহার বাক্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই করে। বাক্ ইন্দ্রিয় হল সেই ইন্দ্রিয় যেটা কেবল দেওয়ার ব্যবহারই করে, নেওয়ার কখনও করে না। এইজন্য পরোপকার কর্মকারী বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বা শরীরাঙ্গের মধ্যে এটাই সবথেকে প্রধান হয়। সকল প্রকারের পরোপকার কর্মের মধ্যে বেদবিদ্যার দান সবথেকে বড় দান মানা হয়েছে, এই জন্য ভগবান্ মনু বলেছেন – 'সর্বেষামেব দানানাম্ ব্রহ্মদানম্ বিশিষ্যতে'। এই সর্বোচ্চ দানটাও বাক্ ইন্দ্রিয় দ্বারাই দেওয়া সম্ভব, এই কারণে যেকোনো মানুষের জন্য বাক্ ইন্দ্রিয় হল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে দুইবার 'বাক্' ব্যবহার করা হয়েছে, এরদ্বারা পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে যে আমার বাক্ ইন্দ্রিয়তে লৌকিক এবং বৈদিক উভয় প্রকারের বাণী বলার শক্তি বজায় থাকুক অর্থাৎ আমরা লোক আর বেদ উভয়ের জ্ঞানী হবো অথবা এর তাৎপর্য এটাও হয় যে আমার বাক্ ইন্দ্রিয়তে বলার সামর্থ্য বজায় থাকুক।

ওম্ প্রাণঃ প্রাণঃ ।

বাক্ এর পশ্চাৎ নাসিকা স্পর্শের বিধান করা হয়েছে। সৃষ্টির মধ্যেও বাক্ তত্ত্বের সঙ্গে প্রাণতত্ত্বের সবথেকে নিকট সম্বন্ধ আছে। বলার শক্তির নিকট সম্বন্ধ প্রাণবায়ুর সঙ্গে হয়। বায়ু নাভি আর হৃদয় থেকে উপরে উঠে কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে ধ্বনিকে উৎপন্ন করে আর তারপর সেই বায়ুই জিহ্বা, তালু আদি স্থানের প্রচেষ্টায় শব্দকে প্রকট করে। এই কারণে এখানে নাসিকার দুইদিকে স্পর্শ করে সাধক প্রার্থনা করে যে আমার নসিকাতে প্রাণ আর অপান দুই প্রকারের বায়ু সম্যক রূপে প্রবাহিত হতে থাকুক, যাতে আমার শরীরে প্রাণতত্ত্ব সর্বদাই

সামর্থ্যবান্ থাকে আর সব ইন্দ্রিয়কেও সামর্থ্যবান্ বানিয়ে রাখে। ধ্যান দেওয়ার বিষয় হল শরীর এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেসব বল বিদ্যমান আছে, সেইসব প্রাণেরই বল হয় আর এইসব বলের মূল পরমাত্মা হওয়ার কারণে তাঁকেও 'প্রাণের প্রাণ' বলা হয়। এইজন্য এখানে সেই প্রাণস্বরূপ পরমাত্মার কাছেই প্রাণশক্তির প্রার্থনা করা হয়েছে।

ওম্ চক্ষুশ্চক্ষুঃ ।

প্রাণের বলের কামনার পশ্চাৎ চোখে দেখার শক্তি বজায় থাকার প্রার্থনা আছে। এই সৃষ্টির অধিকাংশ জ্ঞান আমরা চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই প্রাপ্ত করি। পড়া, দেখা আদি কর্ম চোখ দ্বারাই হয়, এইজন্য এই ইন্দ্রিয়ের সুস্থ থাকাটা অত্যন্ত আবশ্যক। কোনো ব্যক্তি যতই বলবান্ আর বিদ্বান্ হোক না কেন, সে নেত্রহীন হলে সে সেটা করতে পারবে না, যেটা সে করতে চায়। এই কারণে সাধক ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে যে আমার চোখে দেখার শক্তি সদা বজায় থাকুক। পরমাত্মার সৃষ্টির জ্ঞান অন্য ইন্দ্রিয়ের তুলনায় সবথেকে অধিক চোখের দ্বারাই হয়, কারণ ঈশ্বরীয় রচনার যতটা বোধ চোখ দ্বারা হতে পারে, ততটা অন্য কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না। এটাও ধ্যানে রাখতে হবে যে, মানুষের জন্য জ্ঞানের অধিক অন্য কোনো বস্তু নেই, যেমনটা য়োগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জী বলেছেন – 'নহি জ্ঞানেন সদৃশম্ পবিত্রমিহ বিদ্যতে' আর জ্ঞান প্রাপ্ত করার সবথেকে বড় সাধনই হল এই চক্ষু ইন্দ্রিয়।

ওম্ শ্রোত্রম্ শ্রোত্রম্ ।

জ্ঞানপ্রাপ্তির দ্বিতীয় সবথেকে বড় সাধন হল শ্রোত্র। আমরা পড়ে অথবা শুনেই জ্ঞান প্রাপ্ত করি, এই কারণে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ শ্রোত্র ইন্দ্রিয়তে শ্রবণ শক্তি বজায় থাকার প্রার্থনা করা হয়েছে। মানুষ হল এক এমন প্রাণী যারমধ্যে

স্বাভাবিক জ্ঞান সবথেকে কম আছে। এর জন্য নৈমিত্তিক জ্ঞানের আবশ্যকতা হয় আর এই নৈমিত্তিক জ্ঞান দুই ভাবেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব – কারও দ্বারা পড়ে অথবা স্বয়ং পড়ে। স্বয়ং পড়ে বিদ্বান হওয়া অতি কঠিন কাজ, এই কারণে তাকে অন্য কোনো যোগ্য গুরু (মাতা-পিতা, আচার্য আদি) থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত করতে হয় আর এই জ্ঞান শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারাই সে করতে পারে। যে ব্যক্তি স্বয়ং পড়ে, সে কেবল চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই পড়তে পারে, কিন্তু যে অন্যের দ্বারা পড়ে, তাকে শ্রোত্র ইন্দ্রিয়েরই আবশ্যকতা হয়। এই কারণে এখানে জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধন রূপ শ্রোত্র সংজ্ঞক অঙ্গের মধ্যে শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বজায় থাকার প্রার্থনা করা হয়েছে। জ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য যেমন এর আবশ্যকতা আছে, তেমনই লৌকিক ব্যবহারেও চক্ষু ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ এই ইন্দ্রিয়ের স্থান আছে।

এই চারটা ইন্দ্রিয়তে শক্তি প্রাপ্ত করার প্রার্থনার পর সাধক সম্পূর্ণ শরীরের উপর বিচার করে অগ্রিম মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনা করার ক্রমে নিজের ধ্যান নাভি ক্ষেত্রের মধ্যে নিয়ে যায়।

ওম্ নাভিঃ ।

নাভিকে শরীরের কেন্দ্র মানা হয়। নাভি দ্বারাই গর্ভস্থ শিশুর সম্বন্ধ মায়ের সঙ্গে হয়, এর দ্বারাই সম্পূর্ণ পোষণ হয়। নাভি ক্ষেত্রে তিন প্রমুখ তন্ত্র বিদ্যমান আছে – পাচন তন্ত্র, উৎসর্জন তন্ত্র আর উৎপাদক তন্ত্র। এরমধ্যে পাচন তন্ত্র সব থেকে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ, সেটা দুর্বল হলে শরীরের সব অঙ্গ দুর্বল হয়ে যায়। উৎসর্জন তন্ত্র শরীরের বিজাতীয় তত্ত্বকে শরীর থেকে বাইরে বের করে, এমনটা না হলে সম্পূর্ণ শরীর রোগী হয়ে যায়। উৎপাদক অঙ্গের সামর্থ্যের প্রার্থনা করার কারণ হল এর সামর্থ্যবান আর সংযত হওয়ার উপরই পুরুষত্ব আর স্ত্রীত্ব নির্ভর করে। এগুলো দুর্বল হলে অন্য সব অঙ্গ দুর্বল হয় বা হতে থাকে। এই তিন

তন্ত্রের দ্বারা শরীরের সব অঙ্গ প্রভাবিত হয়, এইজন্য সাধক 'ওম্ নাভিঃ' বলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যে নাভিক্ষেত্রতে তার তিন তন্ত্র নাভিরূপে বজায় থাকুক। এখানে নাভি পদ 'নহ বন্ধনে' ধাতু দ্বারা ব্যুত্পন্ন হয়েছে, এর অর্থ হল নাভিক্ষেত্রে বিদ্যমান তিন তন্ত্র সম্পূর্ণ শরীরের অঙ্গকে কোনো-না-কোনো ভাবে বেঁধে রাখে অর্থাৎ প্রভাবিত করে। এই কারণে কাঠক সংহিতার (৩৭.১৬) মধ্যে বলা হয়েছে – 'নাভির্বৈ প্রাণান্ দাধার য়ে চোর্ধ্বা য়ে চাবাঞ্চঃ।'

এখানে সংকেত পাওয়া যায় যে, সব দশ প্রাণের সঙ্গে কোনো-না-কোনো ভাবে নাভির সঙ্গে সম্বন্ধ অবশ্যই আছে। যেভাবে মহাকাশের সঙ্গে বিভিন্ন লোক বাঁধা থাকে, সেইভাবে নাভির সঙ্গে সম্পূর্ণ শরীর বাঁধা থাকে, এইজন্য পুরুষ-সূক্তের মধ্যে মহাকাশকে পরমপুরুষ পরমাত্মার নাভি বলা হয়েছে অর্থাৎ তাকে নাভি থেকে উৎপন্নকারী বলা হয়েছে – নাভ্যাSআসীদন্তরিক্ষম্ (য়জু. ৩১.১৩), যেভাবে মহাকাশের মধ্যে সব লোকের উৎপত্তি হয়, সেইভাবে সব প্রাণীর উৎপত্তিও নাভিক্ষেত্রের মধ্যে হয়। এই কারণে এইসব তন্ত্রকে সুস্থ আর বলবান্ রাখার প্রার্থনা করা হয়েছে।

ওম্ হৃদয়ম্।

উপরোক্ত তিন তন্ত্রের উপর চিন্তন করার পশ্চাৎ সাধক নিজের হৃদয়ের উপর চিন্তন করে। হৃদয়ের কাজ হল সম্পূর্ণ শরীরের মধ্যে শুদ্ধ রক্ত পৌঁছে দেওয়া আর সম্পূর্ণ শরীরের অশুদ্ধ রক্তকে পুনঃ সংগ্রহীত করা। এই কাজে স্বল্প অবরোধ হলেই সম্পূর্ণ শরীর সমাপ্ত হতে পারে। এই ক্ষেত্রের মধ্যে আত্মারও নিবাস বলা হয়েছে। এই কারণে হৃদয় ক্ষেত্র হল শরীরের মুখ্য কেন্দ্র। ভাবনা আর সহানুভূতি এই ক্ষেত্রের মধ্যেই উৎপন্ন হয়। ভাবনাবিহীন ব্যক্তি পশুর সমান হয়, এই কারণে এই দৃষ্টিতেও এই ক্ষেত্র অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়।

বীরতা আর সাহসও এই অঙ্গের গুণ হয়। হৃদয় দ্বারা দুর্বল ব্যক্তি কখনও বীর-সাহসী হতে পারবে না। এইভাবে এই মন্ত্রের দ্বারা সাধক পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যে তার হৃদয়ের রক্ত প্রচলন ক্রিয়া স্নিগ্ধরূপে পরিচালনা করতে সক্ষম হোক আর এরমধ্যে উদাত্ত ভাবনা ও বীরত্বের মতো গুণ সর্বদা বিদ্যমান হোক। দয়া, করুণার মতো ভাবনা হল হৃদয়েরই গুণ। এই মন্ত্রের দ্বারা হৃদয়ের মধ্যে দয়া ও করুণার মতো মানবীয় সদ্ গুণের বিকাশেরও প্রার্থনা করা হয়েছে। সাধকের উচিত যে এর উপর বিচার করার সময় এমন গুণ নিজের হৃদয়ে জাগ্রত করার ভাবনা হৃদয় দ্বারাই করবে।

ওম্ কণ্ঠঃ ।

হৃদয়ের পশ্চাৎ সাধক কণ্ঠের উপর চিন্তন করে। কণ্ঠ হল এমন এক স্থান যা মস্তককে ধড়ের সঙ্গে জুড়ে রাখে। বাক্ আর প্রাণ এই দুইয়ের সম্বন্ধও কণ্ঠের সঙ্গেই হয়। অন্যদিকে পাচন তন্ত্র এবং শ্বসন তন্ত্র, যাদের কারণে অন্য সব তন্ত্র জীবিত থাকে, সেগুলোর মার্গ কণ্ঠ হয়েই যায়। মস্তিষ্ককে সব শরীরাঙ্গের সঙ্গে সংযোগের মার্গও কণ্ঠই হয়। এইভাবে এখানে ঈশ্বরের কাছে কণ্ঠকে বলবান্ হওয়ার কামনার সঙ্গে শরীরের এইসব অঙ্গ বা তন্ত্রকে সুস্থ আর বলবান্ হওয়ার কামনা করা হয়েছে। কণ্ঠ নির্বল হওয়া মানেই বাণী, পাচন তন্ত্র এবং শ্বসন তন্ত্র সব নির্বল হবে আর এগুলো নির্বল হলে সম্পূর্ণ শরীর নির্বল হবে। সংসারের মধ্যেও প্রায় যেসব প্রাণীর গলা দুর্বল হয়, তারা স্বল্পবলযুক্তই হয়।

ওম্ শিরঃ ।

উপরোক্ত সব অঙ্গের সঞ্চালক হল মস্তিষ্ক আর এই মস্তিষ্কের নিবাস হল মস্তক। এই কারণে ‘ওম্ শিরঃ’ এরদ্বারা সাধক এই প্রার্থনা করে যে তার মস্তিষ্ক সুস্থ আর বলবান্ হয়ে থাকুক, মস্তিষ্কগত বুদ্ধি আদি তত্ত্বও বলবান্ হয়ে থাকুক।

মানুষের কাছে বুদ্ধিই হল ঈশ্বরের সর্বোচ্চ বরদান। কোনো মানুষ যতই বলবান্ হোক না কেন, যদি সে বুদ্ধিহীন হয়, তাহলে তার মহত্ব কোনো পশুর থেকে অধিক হবে না। প্রায়শঃ ব্যবহারে এমন দেখা যায় যে পাগল ব্যক্তি কোনো রোগগ্রস্থই হয় না। শীত, উষ্ণ বা সংক্রামক রোগ তার উপর প্রভাব হয় না অথচ বৌদ্ধিক কর্মকারী অনেক রোগগ্রস্থ হতে পারে। তবে পাগল ব্যক্তির জীবন সর্বদা নিরর্থকই হয়। বুদ্ধির অভাবে তার সারা অঙ্গ গুরুত্বহীন হয়ে থাকে, এইজন্য উপরোক্ত সব অঙ্গের উপর চিন্তন করে আর সেগুলো সুস্থ রাখার প্রার্থনা করার পশ্চাৎ মস্তক সুস্থ আর বলবান্ থাকার প্রার্থনা করা হয়েছে।

ওম্ বাহুভ্যাম্ য়শোবলম্ ।

উপরোক্ত সব অঙ্গের পশ্চাৎ সাধক দুই বাহুর যশ আর বলযুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করে। কারও শরীরে যতই বল হোক না কেন, তার অভিব্যক্তি আর প্রয়োগ বাহুর দ্বারাই সম্ভব হয়। বাহু সম্পূর্ণ শরীরের রক্ষক হয়। বাহু কেটে গেলে বড়-বড় বলবান্ যোদ্ধাও সর্বথা বলহীন হয়ে যায়। বাহুর পুরুষার্থ দ্বারাই কোনো মানুষ নিজের জীবনের নির্বাহ করতে পারে। বাহুতে বলের সঙ্গে এখানে যশেরও কামনা করা হয়েছে, কারণ আততায়ী, লোভী বড়-বড় বলবান্ দেখা যায়, যে পাপী পুরুষের মধ্যে যত অধিক বল হয়, সে পাপও ততটাই অধিক ভয়ংকর করতে পারে। সে তার বাণী আর বুদ্ধি আদিতে আসা দুষ্ট বিচারকে ততই অধিক ক্রিয়ান্বিত করতে পারে, যত অধিক তার বাহুতে বল হয়। যদি এমন না হয়, তাহলে তাকে অন্য কারও বাহুর আশ্রয় নিতে হয়। বাহুর আশ্রয় না নিয়ে কোনো অপরাধীও অপরাধকে করতে পারে না। এই কারণে এখানে বলের সঙ্গে-সঙ্গে যশের কামনা করা হয়েছে। অপরাধীর ভয়ংকর কর্ম কখনও যশের শ্রেণীতে আসতে পারে না। যখন কোনো ব্যক্তির বল যশস্বী হয়, সেটা

পরোপকার আদি কর্মের দ্বারাই হয় আর পরোপকার করা কেবল মানুষেরই সামর্থ্য, অন্য কোনো প্রাণীর নয়। এইজন্য এখানে বাহুতে বল আর মস্তিষ্ক, হৃদয় আদি অঙ্গের ভাবনার সঙ্গে বল প্রয়োগ দ্বারা যশস্বী হওয়ার প্রার্থনা করা হয়েছে।

ওম্ করতলকরপৃষ্ঠে।

হাতের করতল আর তার পৃষ্ঠভাগ এগুলো হল বাহুর সেই ভাগ যারদ্বারা বাহু তার সব কাজ সম্পন্ন করতে পারে। বাহুর সব ভালো বা মন্দ কাজ করতে এই ভাগই বিশেষ করে আঙ্গুল অগ্রগামিনী হয়। যশ আর বল দুইয়ের সম্বন্ধ এখানেও উপরোক্তানুসারে বোঝা উচিত। 'করঃ' পদ স্বয়ং 'ডুকৃঞ্ করণে' ধাতু দ্বারা ব্যুত্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হল সম্পূর্ণ শরীরের উপযোগিতা হাতের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। হাতই সম্পূর্ণ শরীরের শুদ্ধি করে। এক্যুপ্রেসার আর এক্যুপাঞ্চারের বিশেষজ্ঞের মতে শরীরের সব অঙ্গের কেন্দ্র এই ভাগের মধ্যেই আছে, যা কেবল হাতের সেই-সেই কেন্দ্রের উপর চাপ অথবা সুচভেদন দ্বারা শরীরের আন্তরিক অঙ্গও সুস্থ হয়ে যায়। এই কারণে এই অঙ্গকে বলবান্ আর যশস্বী হওয়ার প্রার্থনা করা হয়েছে।

জ্ঞাতব্য –

এখানে বল আর যশের সম্বন্ধ অন্য সব মন্ত্র অর্থাৎ সেগুলোতে নির্দিষ্ট অঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দেখা উচিত। এখানে জল দিয়ে স্পর্শ এটাই সংকেত করে যে আমরা প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জলের সমানই নির্মল আর প্রাণবান্ করার চেষ্টা করবো। এখানে সাধক যে-যে অঙ্গের স্পর্শ করে, সেই-সেই অঙ্গের মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মার কৃপায় এক বিশেষ বল আর ঊর্জার সঞ্চার হতে অনুভব করে।

মার্জন-মন্ত্রাঃ

ওম্ ভূঃ পুনাতু শিরসি।
ওম্ ভুবঃ পুনাতু নেত্রয়োঃ।
ওম্ স্বঃ পুনাতু কণ্ঠে।
ওম্ মহঃ পুনাতু হৃদয়ে।
ওম্ জনঃ পুনাতু নাভ্যাম্।
ওম্ তপঃ পুনাতু পাদয়োঃ।
ওম্ সত্যম্ পুনাতু পুনশ্শিরসি।
ওম্ খম্ ব্রহ্ম পুনাতু সর্বত্র।

ওম্ ভূঃ পুনাতু শিরসি।

প্রাণের আধার, সত্যস্বরূপ এবং সকল অপ্রকাশিত লোকের স্বামী পরমাত্মা! আপনি আমার মস্তিষ্কে পবিত্রতা স্থাপন করুন। এই শরীরের মধ্যে মস্তিষ্কই সম্পূর্ণ শরীরের সঞ্চালক হয়, সেইরকম সম্পূর্ণ সৃষ্টির মধ্যে পরমাত্মার প্রাণত্ব গুণ সম্পূর্ণ সৃষ্টির সঞ্চালক হয় আর স্বয়ং প্রাণতত্ত্বও অন্য সব পদার্থের প্রেরক এবং সঞ্চালক হয়। এই কারণে মস্তকের পবিত্রতার জন্য পরমাত্মার এই গুণ দ্বারা স্তুতি সুসঙ্গত হয়। শরীরের সব অঙ্গের দোষকে পরিষ্কারের জন্য মস্তিষ্কগত বিচার পরিষ্কৃত হওয়া অনিবার্য। যদি মানুষের তন্ত্রিকা তন্ত্র নির্দোষ হয়ে যায় তাহলে অন্য সব অঙ্গ নির্দোষ হতে সহজ হবে। যদি বিচারের শুদ্ধি হয়ে যায়, তাহলে সব ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের শুদ্ধি সহজ হবে, এইজন্য সর্বপ্রথম বিচারের শুদ্ধির কামনা করা হয়েছে। যেকোনো মানুষের মধ্যে পাপ বা পুণ্যের প্রাদুর্ভাব

সর্বপ্রথম মন অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যেই হয়। এই কারণে যদি মস্তিষ্কগত বিচারকে শুদ্ধ করে নেওয়া হয় তাহলে কোনো প্রকারের পাপই উদয় হতে পারবে না, এমন স্থিতিতে সংসারে কখনও কোনো অপরাধ হবে না। তারসঙ্গে পরোপকারী আর আধ্যাত্মিক বিচারের উদয় দ্বারা সুখী আর সুসংস্কৃত সমাজের স্থাপনা হতে পারবে।

ওম্ ভুবঃ পুনাতু নেত্রয়োঃ ।

অপানস্বরূপ অর্থাৎ দুঃখ দুর্ব্যসনের অপসারণকারী, অন্তরীক্ষ লোকের স্বামী এবং চেতনস্বরূপ পরমাত্মা! আমার নেত্রে পবিত্রতা স্থাপন করুন। যেভাবে পরমাত্মা আকাশ তত্ত্বের দ্বারা দূর এবং দূরবর্তী লোককে বেঁধে রেখেছেন আর আকাশের মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন তরঙ্গের সঞ্চারণ করেন, সেইভাবে শরীরের মধ্যে আত্মা নেত্রের মাধ্যমে আকাশস্থ সুদূর এবং নিকটবর্তী লোকের সঙ্গে নিরন্তর জুড়ে থাকে। আকাশের মধ্যে সঞ্চারিত প্রকাশ তরঙ্গকে গ্রহণ করে মস্তিষ্কের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানের সর্বাধিক ভাগ নেত্র দ্বারাই গ্রহণ করে। সংসারের বিষয়কে দেখে সুখ আর দুঃখের অনুভূতিও নেত্র দ্বারাই সর্বাধিক হয়। পাপ আর পুণ্যের বিচারও নেত্রের মাধ্যমে দেখা দৃশ্যের দ্বারাই তার মস্তিষ্কের মধ্যে সবথেকে অধিক আসে। সেই সংসারের জ্ঞানও নেত্র দ্বারা দেখে অথবা পড়েই সবথেকে অধিক হয়। আমরা অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিকটবর্তী পদার্থ থেকেই প্রভাবিত হই, কানের দ্বারা কিছু দূরবর্তী পদার্থ থেকেও প্রভাবিত হতে পারি, কিন্তু নেত্র দূর-দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা বিশাল মহাকাশের মধ্যে বিদ্যমান পদার্থ দ্বারাও প্রভাবিত হয়। এই কারণে মস্তিষ্কের পশ্চাৎ সবথেকে অধিক পবিত্রতার আবশ্যকতা নেত্রেরই হয়। এখানে পরমাত্মার চেতন গুণকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। শরীরের অন্য বাহ্য অঙ্গের তুলনায় চেতনার প্রতিবিম্ব চোখের মধ্যেই

প্রতিফলিত হয় আর চোখের মধ্যেই ব্যক্তির মনোভাব আর সংবেদনশীলতা প্রতিবিম্বিত হয়। এই কারণে নেত্র দিয়ে চিতিস্বরূপ পরমাত্মার নিকট প্রার্থনার সম্বন্ধ তর্কসঙ্গত সিদ্ধ হয়। নিজের দৃষ্টির ব্যাপকতার কারণে নেত্রের সম্বন্ধ মহাকাশের সঙ্গেও সিদ্ধ হয়।

ওম্ স্বঃ পুনাতু কণ্ঠে।

সকল প্রকারের চেষ্টার নিমিত্ত, আদিত্য আদি প্রকাশিত লোকের স্বামী, আনন্দস্বরূপ আর আনন্দপ্রদাতা পরমেশ্বর! আমার কণ্ঠক্ষেত্রে পবিত্রতা স্থাপিত করুন। এই সৃষ্টিতে সূর্যাদি লোক নিজের কিরণ দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বকে প্রকাশিত করে, সেইরকম মানুষও বাণীর দ্বারা নিজের জ্ঞানের প্রকাশ করতে পারে। কিরণ ছাড়া কোনো প্রকাশিত লোকই কাউকে মার্গ দেখাতে পারবে না, সেইরকম কণ্ঠ অর্থাৎ বাণী ছাড়া কোনো ব্যক্তিও কাউকে কোনো প্রকারের জ্ঞান দিতে পারে না। সংসারে যে ব্যক্তি যত অধিক জ্ঞান প্রাপ্ত করে, সে ততই অধিক আনন্দও প্রাপ্ত করতে পারে। পরমাত্মা অনন্ত জ্ঞানযুক্ত হওয়ার কারণেই আনন্দ যুক্ত হন। এর অর্থ হল কোনো ব্যক্তি কাউকে যতটা সুখ বাণীর সদুপদেশ দ্বারা দিতে পারবে, ততটা সুখ সে কোনো অপার সম্পত্তি দিয়েও দিতে পারবে না। জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা সবপ্রকার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রধান নিমিত্ত কারণ হয়, সেইভাবে জ্ঞান দ্বারা হওয়া সব ব্যবহারের প্রধান কারণ সদুপদেশই হয়, এইজন্য 'স্বঃ' রূপ পরমাত্মার কাছে কণ্ঠকে পবিত্র হওয়ার প্রার্থনা করা হয়েছে। আজ সংসারে সর্বাধিক অভাব যদি কোনো বস্তুর হয় তাহলে সেটা সদুপদেশের অভাবই হবে, যার কারণে সম্পূর্ণ সংসার অজ্ঞানরূপী অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে সত্য সুখ আর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে।

ওম্ মহঃ পুনাতু হৃদয়ে।

হে সর্বব্যাপক পরমেশ্বর! আমার হৃদয়ে পবিত্র ভাবের সঞ্চার করুন। হৃদয়ের ব্যাকুলতার সঙ্গে সম্বন্ধকে আমরা এইভাবে বোঝার চেষ্টা করবো যে – হৃদয় যেমন রক্তের দ্বারা শরীরের সব অঙ্গকে পবিত্র করে, সেগুলোকে ঊর্জা আর পোষণ প্রদান করে, সেইরকম নিজের ভাবনা আর সহানুভূতির দ্বারাও সম্পূর্ণ শরীরকে প্রভাবিত করে। এইভাবে পরমাত্মাও সৃষ্টির সব সূক্ষ্ম থেকে শুরু করে স্থূল পদার্থকে মূলরূপে ঊর্জা ও পোষণ প্রদান করেন। নানা প্রকারের রশ্মি দ্বারা তিনি বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন ক্রিয়াকে শুদ্ধতা প্রদান করেন আর য়োগনিষ্ঠ সাধকদের ভাবকে পবিত্রতা প্রদান করেন। এই কারণে সেই ব্যাপক পরমাত্মার কাছে হৃদয়ের ভাব আর সহানুভূতিকে পবিত্র করার প্রার্থনা করা হয়েছে।

ওম্ জনঃ পুনাতু নাভ্যাম্।

হে সকল সৃষ্টির উৎপাদক পরমাত্মা! আপনি আমার নাভিক্ষেত্রে শরীরের পূর্বোক্ত তিন তন্ত্রের মধ্যে পবিত্রতা স্থাপিত করুন। শরীরের পাচন তন্ত্র নানা প্রকারের রসকে উৎপন্ন করে সম্পূর্ণ শরীরের পোষণ করে আর এমনটা করার জন্য সেই রস দ্বারা শরীরে সব সপ্ত ধাতুর নির্মাণ হয়। এই রস আদি উৎপাদনের প্রক্রিয়াতে যেসব অবশিষ্ট বা বিজাতীয় পদার্থ হয়, তাকেও নাভি ক্ষেত্রতে বিদ্য-মান উৎসর্জন তন্ত্র বাইরে বের করে। যদি এই দুই তন্ত্রের মধ্যে কোনো অশুদ্ধি বা বিকৃতি আসে, তাহলে তার কষ্ট সম্পূর্ণ শরীরকে ভুগতে হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে শরীরের সব রোগের প্রমুখ এবং প্রাথমিক কারণ এই দুই তন্ত্রের অশুদ্ধি বা বিকৃতিই হয়। অশুদ্ধ আহার আর উৎসর্জন তন্ত্রের বিকৃতি না কেবল শারীরিক রোগকে উৎপন্ন করে, অপিতু মনোবিকার এবং বুদ্ধিকেও বিকৃত করে। এই কারণে এই দুই অঙ্গ পবিত্র আর সুস্থ থাকাটা অনিবার্য। এই

ক্ষেত্রের মধ্যে গর্ভস্থ শিশুরও নির্মাণ হয়। এই কারণে এই নির্মাণের প্রক্রিয়া আর উৎপাদক অঙ্গের শুচিতাও অনিবার্য। এটা ছাড়া সুস্থ আর সংস্কৃতিবান সন্তানের নির্মাণ করা যাবে না। এইজন্য এই মন্ত্রে উৎপাদক পরমাত্মার কাছে এইসব পদার্থ আর শিশুর নির্মাণ হেতু এইসব অঙ্গের শুচিতার প্রার্থনা করা হয়েছে।

ওম্ তপঃ পুনাতু পাদয়োঃ ।

সেই তপঃ স্বরূপ পরমাত্মা আমার পায়ে পবিত্রতা প্রদান করুক। এখানে 'তপঃ' পদের অনেক অর্থ হওয়া সম্ভব, যারমধ্যে প্রথম অর্থ হল – সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে নিজের সামর্থ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রণকারী, আর তপের দ্বিতীয় অর্থ হল–প্রত্যেক পরিস্থিতিতে প্রত্যেক অনিষ্ট পদার্থকে নষ্ট বা নিয়ন্ত্রিত করে নিরন্তর ক্রিয়াশীল থাকা আর তৃতীয় অর্থ হল – সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে আধার প্রদান করা। শরীরের মধ্যে পায়ের কাজও এটাই। সব পা-যুক্ত প্রাণীদের সারা জীবনের আধার কাজ এই পা-ই করে, সারা জীবন ধরে পা সম্পূর্ণ শরীরের ভার বহন করে; কাদা, নুড়ি, পাথর, কাটা যেখানেই যাওয়া হোক, এই পা সম্পূর্ণ শরীরকে এইরূপ বিপত্তি থেকে পার করিয়ে দেয় আর এইসব পীড়াকে পা-ই সহ্য করে। সেইরকম পরমাত্মাও আমাদের সকলকে দুঃখ থেকে পার করে দেন। পায়ের বিকৃতি মহা-বলবান্ আর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকেও অসহায় বানিয়ে দেয়। এইজন্য এখানে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে যে তিনি যেন আমাদের পা-কে পবিত্র রাখেন। আমাদের পা না কেবল রোগ রহিত হবে, অপিতু সত্ পথেও চলবে।

ওম্ সত্যম্ পুনাতু পুনশ্শিরসি ।

সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা আমার শিরস্থ অঙ্গকে পুনঃ পবিত্র করুক। পবিত্রী-করণের কামনার প্রারম্ভ মস্তিষ্ক থেকেই হয়েছিল। এই মস্তিষ্কই হল সম্পূর্ণ শরীরের সঞ্চালক আর নির্দেশক আর এটাই হল সম্পূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র।

পরমাত্মাকেও সত্যস্বরূপ এইজন্য বলা হয় কারণ তিনি সম্পূর্ণ সৃষ্টির সত্য বিজ্ঞানকে জানেন। সৃষ্টির পশ্চাৎ প্রলয় আর এই দুইয়ের অনাদি এবং অনন্ত প্রবাহকেও জানেন। তিনি সব জীবাত্মার সব প্রকারের কর্ম আর সংস্কারকে জানেন। এর অতিরিক্ত আরও যা কিছু আছে, সেইসবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার যথার্থ স্বরূপকে জানেন। এইভাবে শরীরের মধ্যে বিদ্যমান সব অঙ্গকে এই জীবাত্মা যতটা জানে, সেটা এই মস্তিষ্ক আর তারমধ্যে স্থিত বুদ্ধির দ্বারাই জানে। শরীরের অতিরিক্ত সৃষ্টি আদির বিষয়েও আমরা যা জানি বা জানতে পারি, তার সাধন হল এই মস্তিষ্কই। ত্বকের অতিরিক্ত সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় কেবল এই ভাগের মধ্যে বিদ্যমান হয়। এইসব ইন্দ্রিয় বুদ্ধির সাপেক্ষ সাধনের কাজ করে। এইসবের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান যার যতটা অধিক শুদ্ধ হবে, সে ততই অধিক সুখকে প্রাপ্ত করতে পারবে। এই কারণে সর্বোচ্চ সত্যবিজ্ঞানী পরমাত্মার কাছে পুনঃ শিরস্থ অঙ্গকে পবিত্র করার প্রার্থনা করা হয়েছে।

শাস্ত্রের মধ্যে সত্যের মহিমা সর্বোপরি দর্শানো হয়েছে, এইজন্য উপনিষৎ-কার বলছেন – **'নহি সত্যাত্পরো ধর্মঃ।'** মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামের কথন হল – **'সত্যমেবেশ্বরো লোকে।'** অন্যদিকে বেদ স্বয়ং বলেছে – **'সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্য়েণোত্তভিতা দ্যৌঃ।'** এইরূপ সত্যের ভাণ্ডার পরমাত্মার কাছে সত্যের দ্বারাই বুদ্ধি আর জ্ঞানেন্দ্রিয়কে পবিত্র করার এখানে প্রার্থনা আছে। ভগবান্ মনুর কথন হল –

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাম্ ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥ (মনুঃ ৫.১০৯)

এখানে মনকে সত্যের দ্বারা শুদ্ধ হওয়া স্পষ্ট লেখা আছে। সত্যেরই অপর নাম হল জ্ঞান, যেটা সত্য নয়, সেই তথ্যকে জ্ঞান বলা যেতে পারে না।

এই কারণে জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি পবিত্র হওয়াও সত্যের দ্বারা বুদ্ধির পবিত্র হওয়া বলা হবে।

ওম্ খম্ ব্রহ্ম পুনাতু সর্বত্র।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব অঙ্গ পবিত্র করার প্রার্থনাতে সম্পূর্ণ শরীরের পবিত্রতার প্রার্থনা সম্মিলিত আছে, পুনরায় আকাশের সমান ব্যাপক সর্বতোমহান্ পরমাত্মার কাছে পবিত্রীকরণের কামনা করা হয়েছে। এখানে 'সর্বত্র' শব্দের অর্থ কি, এটা বিচারণীয়। শরীরের পবিত্রীকরণের কামনার পশ্চাৎ 'সর্বত্র' শব্দের প্রয়োগ হওয়াটা এই দর্শায় যে এরমধ্যে সাধক স্বয়ংকে পবিত্র হওয়ার প্রার্থনা তো করছে না, বরং নিজের চারিদিকে বিদ্যমান পরিবেশকে পবিত্র হওয়ার কামনা করছে। যদি আমাদের শরীর আর ভাব পবিত্র হয়েও যায়, কিন্তু অন্য মানুষের ব্যবহার অপবিত্র থাকে, অন্য প্রাণী আর বনস্পতি যদি অপবিত্র বা দোষ যুক্ত থাকে, তখন কেবল আমাদের পবিত্রতাও আমাদের সুখ দিতে পারবে না। এই কারণেই এখানে সর্বব্যাপক পরমাত্মার কাছে সকল পদার্থকে পবিত্র হওয়ার প্রার্থনা করা হয়েছে।

এখানে সাধক যেসব অঙ্গ পবিত্রতা হেতু প্রার্থনা করে, সেইসব অঙ্গের দোষকে বিচার করে সেগুলো দূর হওয়ার আর সেইসব অঙ্গে পবিত্রতার সঞ্চার হওয়াকেও অনুভব করে।

প্রাণায়াম-মন্ত্রাঃ

ওম্ ভূঃ। ওম্ ভুবঃ। ওম্ স্বঃ। ওম্ মহঃ। ওম্ জনঃ। ওম্ তপঃ। ওম্ সত্যম্॥

এইসব পদের ব্যাখ্যা আমি মার্জন মন্ত্রের মধ্যে করেছি। পাঠক/সাধক সেটা বিচার করে, প্রাণায়াম করার সময় তদনুকূল ভাবনা করার চেষ্টা করবেন। প্রাণায়াম করার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এই মন্ত্রের মধ্যে নির্দিষ্ট পরমাত্মার শক্তিকে নিজের শরীরে প্রবেশ করছে অনুভব করবেন।

অঘমর্ষণ-মন্ত্রাঃ

ওম্ ঋতম্ চ সত্যম্ চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥ [ঋগ্বেদ ১০.১৯০.১]

এই তিন মন্ত্রের ঋষি হল অঘমর্ষণ। [**অঘঃ** = কিল্বিষম্ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৫.৩.৭), অঘম্ হন্তের্নিহ্রসিতোপসর্গ আহন্তীতি (নিরুক্ত ৬.১১)] এখানে 'কিল্বিষ্' হল সেই বাধক পদার্থ, যেটা অসুর পদার্থেরই একটা রূপ হয়। এই অসুর তত্ত্ব যেকোনো কণার সঙ্গতিকরণ বা একীকরণে অবরোধ উৎপন্ন করে। এইরকম পদার্থের নাশকারী রশ্মিকেই অঘমর্ষণ ঋষি বলা হয়। এইভাবে এমন বলা যেতে পারে যে এইসব ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি বজ্র রশ্মি থেকে হয়েছে। এগুলো দেবতা হল 'ভাববৃত্তম্' আর ছন্দ বিরাডনুষ্টুপ্। [**বৃত্তম্** = সর্বতো দৃঢম্ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৪.৩১.৪)] এইভাবে 'ভাববৃত্তম্' পদের অর্থ হল– পদার্থের ঘনীভূত হওয়ার প্রক্রিয়া। এইভাবে এর দৈবত আর ছান্দস প্রভাব দ্বারা সৃষ্টি উৎপত্তির সময় সূক্ষ্ম পদার্থের সংঘনন প্রক্রিয়াতে ভাগ নেওয়া বিভিন্ন ছন্দ রশ্মি সহজভাবে কাজ করতে থাকে।

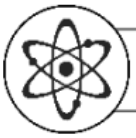

আধিদৈবিক ভাষ্য

(**ঋতম্, চ, সত্যম্, চ, অভিऽইদ্ধাত্, তপসঃ, অধি, অজায়ত**) সেই পরমাত্মা [**তপঃ** = তপসি বিজ্ঞানে (ঋগ্বেদাভাষ্যভূমিকা, ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়), 'তপো দীক্ষা' (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.৪.৩.২), 'তপঃ স্বিষ্টকৃত্' (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১.২.৭.১৮)] সৃষ্টি রচনার নিজের কামনাকে জাগ্রত করে নিজের সামর্থ্য দ্বারা বিজ্ঞানপূর্বক সর্বপ্রথম ঋত আর সত্য এই জোড়কে প্রকট করেন।

[**ঋতম্** = ওমিত্যেতদেবাক্ষরমৃতম্ (জৈমিনীয়োপনিষদ ব্রাহ্মণ ৩.৬.৮.৫), ব্রহ্ম বাऽঋতম্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৪.১.৪.১০, জৈমিনীয়োপনিষদ ব্রাহ্মণ ৩.৬.৮.৫), **সত্যম্** = সত্যম্ কস্মাত্? সত্সু তায়তে সত্প্রভবম্ ভবতীতি বা (নিরুক্ত ৩. ১৩) সত্য ব্রহ্মণি (প্রতিষ্ঠিতম্) (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩.৬)]

এখানে 'ঋত' এর তাৎপর্য সর্বপ্রথম উৎপন্ন পরা 'ওম্' রশ্মির সঙ্গে হবে। এই 'ওম্' রশ্মিগুলো সর্বদা ব্রহ্ম দ্বারা প্রেরিত হওয়ার কারণে তথা সম্পূর্ণ মূল প্রকৃতি পদার্থের মধ্যে উৎপন্ন বা ব্যাপ্ত হওয়ার কারণেই ব্রহ্ম বলা হয়। এই রশ্মি অন্য সব পদার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে এবং সব ক্রিয়া আর বলের মূল হওয়ার কারণে ব্রহ্মরূপ বলা হয়। এর উৎপত্তির পশ্চাৎ সেই পরমাত্মা সত্য অর্থাৎ প্রকৃতির অক্ষররূপ অবয়বগুলোকে উৎপন্ন বা জাগ্রত করেন। এখানে উৎপন্ন করার তাৎপর্য হল সেইসব অক্ষররূপ রশ্মিকে অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত করে দেওয়া, নিষ্ক্রিয় থেকে সক্রিয় করে দেওয়া মাত্র হবে। একে এইভাবেও বলা যেতে পারে যে সেই ঈশ্বর সর্বপ্রথম অব্যক্ত 'ওম্' রশ্মিকে ঊর্জা প্রদান করে সক্রিয় করেন আর সেগুলোর দ্বারাই তারপর অন্য অক্ষর রশ্মিগুলোকে জাগ্রত বা সক্রিয় করেন। এখানে 'চ' নিপাতের দুইবার প্রয়োগ হয়েছে, এটা এই

বিষয়ের সংকেত করে যে ঈশ্বরের সঙ্গে ঋতরূপ 'ওম্' রশ্মির সরাসরি সংযোগ থাকে আর 'ওম্' রশ্মির সঙ্গে অন্য সব অক্ষর রশ্মির সরাসরি সংযোগ থাকে। এখানে 'জনী প্রাদুর্ভাবে' ধাতুর 'অধি' উপসর্গপূর্বক প্রয়োগ হয়েছে। এই উপসর্গকে মহর্ষি য়াস্ক উপরিভাব এবং ঐশ্বর্য, এই দুই অর্থে ব্যবহৃত করেছেন। এর অর্থ হল 'ওম্' এবং অন্য অক্ষররূপ রশ্মিগুলো সৃষ্টির সব সূক্ষ্ম আর স্থূল পদার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাকালীন সেগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করে। ঋষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ৪.৩০.১২ ভাষ্যতে এই উপসর্গকে মধ্য অর্থেও গ্রহণ করেছেন আর ঋগ্বেদ ১.১২৬.১ ভাষ্যতে আধার অর্থেও একে ব্যবহৃত করেছেন। এই কারণে এই রশ্মিগুলো সব পদার্থের মধ্য এবং আধার ভাগে অর্থাৎ সর্বত্র বিদ্যমান থাকে। এইসব রশ্মি সৃষ্টিতে আজও আবশ্যকতানুসারে প্রকট বা ব্যক্ত হচ্ছে। এইসবের প্রকটীকরণ ও মিলন বিজ্ঞানপূর্বকই হয়। এখানে 'তপসঃ' পদের বিশেষণ রূপে 'ইদ্ধাত্' পদের প্রয়োগ আছে। এর অর্থ হল সেই তপঃ সংজ্ঞক বিজ্ঞান সেই সময় প্রকাশিত হয়ে স্বয়ং প্রকট হয়। এর পূর্বে এই বিজ্ঞান পরমাত্মার মধ্যেই অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান থাকে।

(**ততঃ**, **রাত্রী**, **অজায়ত**, **ততঃ**, **সমুদ্রঃ**, **অর্ণবঃ**) সেই ঈশ্বর দ্বারা রাত্রিরূপ অহংকার উৎপন্ন হয়। এই বিষয়ে মহাভারতকার ব্রহ্মাদি ঋষিদের উদ্ধৃত করে লিখেছেন –

অহম্কারাত্ প্রসূতানি মহাভূতানি পঞ্চ বৈ।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ।।১।।
অতঃ পরম্ প্রবক্ষ্যামি সর্বে বিবিধমিন্দ্রিয়ম্।
আকাশম্ প্রথমম্ ভূতম্ শ্রোত্রমধ্যাত্মমুচ্চতে ।।১৮।।

(মহাভারত আশ্বমেধিক পর্ব, অনুগীতা পর্ব. অধ্যায় – ৪২)

অর্থাৎ অহংকার (যাকে আমরা এই গ্রন্থের মধ্যে অনেক স্থানে মনস্তত্ত্বের সমকক্ষই বর্ণিত করেছি।) দ্বারাই পাঁচ মহাভূত উৎপন্ন হয়, যারমধ্যে আকাশ মহাভূতের উৎপত্তি সর্বপ্রথমে হয়। এইসময় শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়েরও উৎপত্তি হয়।

অন্যদিকে এই বিষয়ে মহর্ষি ভৃগু মহর্ষি ভরদ্বাজকে বলেছেন –

পুরা স্তিমিতমাকাশমনন্তমচলোপম্ ।
নষ্টচন্দ্রার্কপবনম্ প্রসুপ্তমিব সম্বভৌ ।।৯।।
ততঃ সলিলমুত্পন্নম্ তমসীবাপরম্ তমঃ ।
তস্মাচ্চ সলিলোত্পীডাদুদতিষ্ঠত মারুতঃ ।।১০।।

(মহাভারত শান্তি পর্ব, মোক্ষধর্ম পর্ব, অধ্যায় – ১৮৩)

অর্থাৎ সম্পূর্ণ অহংকার (মনস্তত্ত্ব) পদার্থ স্থির অনন্ত অবকাশরূপ তমোময় আকাশের সমান তথা তারমধ্যেই বিদ্যমান ছিল। সেই সময় চন্দ্র, সূর্য, বায়ু আদি সব পদার্থ নষ্ট অর্থাৎ নিজের কারণ রূপে সেই অচল, অনন্ত পদার্থের ভিতরে ঘুমাচ্ছিল অর্থাৎ তারমধ্যেই লীন ছিল। সেই অহংকার বা মনস্তত্ত্ব থেকে সলিল [সলিলম্ = আপো হ বা ऽইদমগ্রে সলিলমেবাস (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১.১.৬.১), অন্তরিক্ষম্ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৭.৪৯.১), (আপঃ = অন্তরিক্ষনাম – নিঘন্টু ১.৩)] অর্থাৎ সকলকে নিজের ভিতরে ব্যাপ্ত বা লীনকারী আকাশ নামক মহাভূত উৎপন্ন হয়। সেই আকাশ এমন প্রতীত হচ্ছিল যেন একটা অন্ধকারের মধ্যে তার দ্বারাই অন্য আরেকটা অন্ধকার উৎপন্ন হয়েছে। অন্ধকারকেই ঋষিরা রাত্রি বলেছেন – 'তমো রাত্রিঃ' (তৈত্তেরীয় ব্রাহ্মণ ১.৫.৯.৫) আর রাত্রিকে সাবিত্রী বলেছেন – 'রাত্রিঃ সাবিত্রী' (গোপথ ব্রাহ্মণ পূর্বভাগ ১.৩৩)। সর্ববিদিত যে, অহংকার থেকেই সব পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে, এই কারণে সাবিত্রী আর রাত্রি উভয় পদই অহংকার তত্ত্বের জন্য সর্বদা উপযুক্ত। এটাও জ্ঞাতব্য যে 'ওম্'

এবং অন্য অক্ষররূপ রশ্মির উৎপত্তির পশ্চাৎই মূল প্রকৃতি অহংকারে পরিবর্তিত হয়।

[**সমুদ্রঃ** = সমুদ্রঃ অন্তরিক্ষনাম (নিঘন্টু ১.৩), অয়ম্ বৈ সমুদ্রো য়োऽয়ম্ (বায়ু) পবতऽএতস্মাদ্বৈ সমুদ্রাত্ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি সমুদ্রবন্তি (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪.২.২.২), আপো বৈ সমুদ্রঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.৮.৪.১১)। **অর্ণম্** = উদকনাম (নিঘন্টু ১.১২)]

সেই অন্ধকার রূপ অহংকার থেকে অসংখ্য তন্মাত্রাযুক্ত বায়ুতত্ত্ব দ্বারা পূর্ণ আকাশ উৎপন্ন হয়। এখানে এই বিশাল আকাশস্থ পদার্থকে উদকযুক্ত বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল সেই সম্পূর্ণ পদার্থ জলের মতো একে-অপরকে সিঞ্চিত করতে-করতে অর্থাৎ একে-অপরের সঙ্গে সংযোগের প্রবৃতিকারী হয়ে বিশাল স্রোতের রূপে প্রবাহিত হতে থাকে অথবা জলে ভরা সমুদ্রের মতো সম্পূর্ণ ক্ষেত্রে স্রোতযুক্ত হতে থাকে। অহংকার রূপ পদার্থের মধ্যে যে শান্তি আর অপেক্ষাকৃত স্থিরতা বিদ্যমান থাকে, সেই অবস্থা ভঙ্গ হয়ে পদার্থ অনেক প্রকারের রশ্মি, তরঙ্গ আর স্রোতযুক্ত হতে থাকে। এই সময় পদার্থের মধ্যে অনেক প্রকারের সূক্ষ্ম কণার উৎপত্তি হয়, যাদের এখানে তন্মাত্রা বলা হয়েছে।

আধ্যাত্মিক ভাষ্য

সেই পরমাত্মা নিজের জ্ঞানপূর্বক তপ দ্বারা সত্য= সতে হিতম্ ইতি সত্যম্ অর্থাৎ সত্যস্বরূপ স্বয়ংয়ের মধ্যে বিদ্যমান সৃষ্টির ঋতম্ অর্থাৎ সৃষ্টির অবিনাশী নিয়ম অর্থাৎ সেই অবিনাশী বিজ্ঞানকে প্রকট করেন। যেভাবে কোনো নির্মাণ-কারী ভবন বানানোর পূর্বে ভবনের মানচিত্রকে নিজের মস্তিষ্কের মধ্যে উপস্থিত করে, সেইভাবে পরমেশ্বর সৃষ্টি-বিজ্ঞানরূপ বেদকে প্রকটাবস্থাতে নিয়ে এসে

অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে রাত্রিরূপী মহত্, অহংকার এবং মনস্তত্ত্বকে উৎপন্ন করেন। এদের এইজন্য রাত্রি বলে কারণ তিন পদার্থ প্রকৃতির মতো তো নয় তবে প্রায় অন্ধকাররূপই হয়। একইসঙ্গে এগুলো সৃষ্টির সকল পদার্থকে 'রাতীতি রাত্রিঃ' প্রলয়ের ক্রমে আশ্রয় প্রদান করে অথবা সকল লোক-লোকান্তর এদের মধ্যেই মিলে যায় অর্থাৎ লীন হয়ে যায়। সেই মনস্তত্ত্ব আদি থেকে পরমাত্মা বিশাল সূক্ষ্ম পদার্থ সমূহ রূপী বিশাল আকাশকে উৎপন্ন করেন। এইসব ক্রিয়া ঈশ্বরের নিশ্চিত বিজ্ঞানের অনুসারেই হয় আর প্রত্যেক ক্রিয়ার পিছনেও অন্তিম প্রেরণা আর বল ঈশ্বরেরই হয়।

[এই মন্ত্রগুলোর আধিভৌতিক পক্ষ এই হল যে, সাধক সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে নশ্বর মেনে সকল প্রাণীকে পরমাত্মার পরিবার মেনে সবার সঙ্গে প্রীতিপূর্বক ব্যবহার করবে। যদি এইরূপ না হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে যে তার দ্বারা এই মন্ত্রের আত্মসাত্ করা হয়নি। সাধনার অতিরিক্ত আমি এই মন্ত্রগুলোর আধিভৌতিক ভাষ্যও করার চেষ্টা করেছি। এই ক্রমে এই মন্ত্রের দেবতা 'ভাববৃত্তম্' এর অর্থ হল 'যেসব পদার্থ বিদ্যমান আছে, সেগুলোর ব্যবহার আর স্বরূপ'।]

আধিভৌতিক ভাষ্য

(**অভি**, **ইদ্ধাত্**, **তপসঃ**) সম্পূর্ণ লোকব্যবহারের জ্ঞাতা বিদ্বানের প্রকাশ-মান জ্ঞান আর পুরুষার্থের দ্বারা (**ঋতম্**, **চ**, **সত্যম্**, **চ**, **অজায়ত**) ঋত অর্থাৎ সৃষ্টির অনুকূল নিয়ম আর ব্যবহার তথা সত্য অর্থাৎ বর্তমান পরিস্থিতির অনুকূল নানা প্রকারের বিধানের নির্মাণ করা হয়। সমাজ বা রাষ্ট্রকে সম্যক্ রূপে চালানোর জন্য দুই প্রকারের নিয়মের আবশ্যকতা হয়, তারমধ্যে প্রথম নিয়ম হল, যেটা সর্বদা অপরিবর্তনীয় থাকে আর দ্বিতীয় নিয়ম হল, যেটা দেশ, কাল ও পরিস্থিতি

অনুসারে পরিবর্তিত হতে থাকে। এরমধ্যে প্রথম প্রকারের নিয়মকে ঋত আর দ্বিতীয় প্রকারের নিয়মকে সত্য বলা হয়। এই দুই প্রকারের বিধানকে কোনো বেদজ্ঞ য়োগী রাজাই বানাতে পারবেন।

(**ততঃ**, **রাত্রী**, **অজায়ত**) [**রাত্রিঃ** = তমঃ পাপ্পা রাত্রিঃ (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১৭.৬.৯; (গোপথ ব্রাহ্মণ উত্তরভাগ ৫.৩), য়জমান দৈবত্যম্ বা অহঃ। ভ্রাতৃব্য-দৈবত্যা রাত্রিঃ (তৈত্তেরীয় ব্রাহ্মণ ২.২.৬.৪)] তার দ্বারাই রাষ্ট্র আর সমাজের মধ্যে হতে পারে এমন নানা প্রকারের অনিষ্ট, দুঃখ এবং অপরাধের বিজ্ঞানকে জানা আর জানানো হয়। যেকোনো রাষ্ট্র আর সমাজের সংরক্ষণে এইসব জেনে রাখাটা আবশ্যক। যুদ্ধ আর অস্ত্র-শস্ত্রের বিজ্ঞান হল এরই একটা ভাগ।

(**ততঃ**, **সমুদ্রঃ**, **অর্ণবঃ**) 'সমুদ্র' পদের নির্বচনে মহর্ষি য়াস্কের কথন হল – 'সমুদ্রঃকস্মাত্ ? সমুদ্রবন্ত্যস্মাদাপঃ, সমভিদ্রবন্ত্যেনমাপঃ, সম্মোদন্তে ऽস্মিন্ ভূতানি, সমুদকো ভবতি, সমুনত্তীতি বা।' (নিরুক্ত ২.১০) এর মধ্যে আমি 'সম্মোদন্তেऽস্মিন্ ভূতানি'-কেই গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করি। অন্য নির্বচন আধিভৌতিক অর্থের সঙ্গে সুসঙ্গত নয়। [**অর্ণবঃ** = প্রাণো বা অর্ণবঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৭.৫.২.৫১)] এইভাবে এই বিধানের দ্বারা ব্রহ্মবেত্তা রাজা এমন প্রাণবান্ রাষ্ট্রের নির্মাণ করে, যার মধ্যে বাস করা প্রজাজন আর সকল প্রাণী সেইভাবে প্রসন্নতাপূর্বক বিচরণ করে, যেভাবে সমুদ্রে জলচর সুখপূর্বক বিচরণ করে। মহাভারতে ভীষ্ম পিতামহ রাজা পদের নির্বচনে বলেছেন – 'রাজা রঞ্জনাত্' অর্থাৎ যে রাজা সম্পূর্ণ প্রজাকে আনন্দিত করে, সে রাজা হওয়ার যোগ্য হয়।

ওম্ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বত্সরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥ [ঋগ্বেদ ১০.১৯০.২]

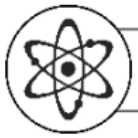

আধিদৈবিক ভাষ্য

(**সমুদ্রাত্, অর্ণবাত্**) সেই বায়ু আর বিভিন্ন তন্মাত্রাপূর্ণ বিশাল আকাশ থেকে অর্থাৎ আকাশস্থ সেই পদার্থ থেকে আর তারসঙ্গে এই সম্পূর্ণ পদার্থকে সংকুচিত করে আকাশ থেকে (**সম্বত্সরঃ, অধি, অজায়ত**) প্রকাশযুক্ত বিশাল খগোলীয় মেঘ উৎপন্ন হয়। এখানে 'অধি' উপসর্গ এই সংকেত করে যে এই মেঘ একা নয় বরং অনেক মেঘ সেই আকাশস্থ পদার্থের ভিতরে উৎপন্ন হতে থাকে আর যেমন-যেমন ভাবে সেই মেঘের আকার বাড়তে থাকে, তেমনি-তেমনি সেগুলোর ঐশ্বর্য অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ বা আকর্ষণও বাড়তে থাকে, এরফলে সেগুলো নিজের নিকটবর্তী পদার্থকে ঘনীভূত করে আরও অধিক বেড়ে যায়। এই সংকোচন ক্রিয়াতে আকাশ তত্ত্বেরই ভূমিকা থাকে।

[**সম্বত্সরঃ** = সম্বসন্তেঽস্মিন্ ভূতানি (নিরুক্ত ৪.২৭), সম্বত্সরো বিশ্বকর্মা (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৪.২২), অগ্নিঃ সম্বত্সরঃ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৭.১৩.১৭), তস্য য়দ্ ভাতি তত্ সম্বদ্, য়ন্মধ্যে কৃষ্ণম্ মণ্ডলম্ তত্ সর ইত্যধিদেবতম্ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ২.২৮-২৯)]

এই বচন দ্বারা সেই বিশাল খগোলীয় মেঘের স্বরূপ এইভাবে প্রকট হয়েছে –

সেই মেঘ ঊষ্মা আর প্রকাশ যুক্ত হয়, তবে সম্পূর্ণ মেঘ সমান দীপ্তিকারীও হয় না। এরমধ্যে অনেক ক্ষেত্র তেজস্বী, তো কিছু ক্ষেত্র কম তেজস্বী অথবা কৃষ্ণ বর্ণযুক্ত হয়। এই বিশাল মেঘের মধ্যে অনেক প্রকারের কণা আর বিকিরণ বিদ্যমান থাকে আর এখানে অনেক লোককে নিজের গর্ভের মধ্যে ধারণ করে। এই কারণে কালান্তরে সূর্য আর গ্রহাদি লোক এর দ্বারাই উৎপন্ন হয়।

(**বিশ্বস্য**, **মিষতঃ**, **বশী**, **অহোরাত্রাণি**, **বিদধত্**) [এখানে 'মিষতঃ' পদ 'মিষ স্পর্ধায়াম্' ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হয়েছে।] এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পরস্পর স্পর্ধা করে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম পদার্থ আর বিশাল থেকে বিশাল লোক, যে নিজের বলের কারণে একে-অপরের সঙ্গে স্পর্ধা করছে বলে মনে হয়, সেইসব পদার্থকে নিয়ন্ত্রণকারী কাল তত্ত্ব অহোরাত্র অর্থাৎ প্রকাশ আর অন্ধকারের (দৃশ্য এবং অদৃশ্য পদার্থ, যারদ্বারা সম্পূর্ণ সৃষ্টি নির্মিত হয়েছে) সৃষ্টি করে। কালের বিষয়ে অথর্ববেদের কথন হল –

কালোऽমূম্ দিবমজনয়ত্কাল ইমাঃ পৃথিবীরুত।
কালে হ ভূতম্ ভব্যম্ চেষিতম্ হ বিতিষ্ঠতে ॥

কালো ভূতিমসৃজত কালে তপতি সূর্য়ঃ।
কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্বি পশ্যতি ॥

তেনেষিতম্ তেন জাতম্ তদু তস্মিন্প্রতিষ্ঠিতম্।
কালো হ ব্রহ্ম ভূত্বা বিভর্তি পরমেষ্ঠিনম্ ॥ [অথর্ব.১৯.৫৩.৫,৬,৯]

এইসব মন্ত্রের মধ্যে কালকেই সর্বকর্তা আর সর্বপ্রেরক বলা হয়েছে। এইজন্য এখানে একে সকল বলযুক্ত পদার্থের বশী বলা হয়েছে। পদার্থকে বল-যুক্ত বলার তাৎপর্য হল বল ছাড়া সৃষ্টির মধ্যে কোনো ক্রিয়াই হওয়া সম্ভব নয়।

সেই কালতত্ত্বের কারণে কালান্তরে বিভিন্ন লোকের নির্মাণ হয়ে সেগুলোর মধ্যে পরিক্রমণ আর ঘূর্ণন গতি উৎপন্ন হয়, যে কারণে রাত আর দিনের সৃষ্টি হয় আর এই সৃষ্টির মধ্যে লোকও প্রকাশিত আর অপ্রকাশিত দুই প্রকারের হয়। এইভাবে কণাও দুই প্রকারের হয়।

আধ্যাত্মিক ভাষ্য

সেই সদ্যোনির্মিত আকাশ, যেটা সূক্ষ্ম কণা আর বিকিরণের বিশাল মহা-সাগরের রূপ ধারণ করে, সেখান থেকে সেই পরমাত্মা সম্বত্সর অর্থাৎ বিশাল খগোলীয় আগ্নেয় পিণ্ড আর কোথাও প্রকাশ ও কোথাও অন্ধকারের সৃষ্টি করেন। সেই পরমাত্মা এইসব প্রকারের ক্রিয়ার কর্তা এবং সঞ্চালক হওয়ার পাশাপাশি তিনি সব বলের স্বামীও হন। তাঁর বল ছাড়া কোনো জড় পদার্থের মধ্যে কোনো প্রকারের বল বা ক্রিয়া হওয়া সম্ভব নয়। বলপতি হওয়ার কারণেই তিনি সমস্ত সৃষ্টির নিয়ন্তা হন। তিনি না কেবল জড় পদার্থকে বল প্রদান করেন, অপিতু চেতন প্রাণীদেরও কর্মানুসারে শরীর প্রদান করে বল প্রদান করেন। তিনি তাঁর উপাসকদের আত্মবল প্রদান করে বড়-বড় কষ্টকে সহ্য করার সামর্থ্যও প্রদান করেন। এই কারণে বেদ বলেছে – 'য় আত্মদা বলদা য়স্য বিশ্ব উপাসতে' এবং 'তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোঃ'।

আধিভৌতিক ভাষ্য

(**সমুদ্রাত্, অর্ণবাত্, সম্বত্সরঃ, অধি, অজায়ত**) এমন সমাজের নির্মাণ দ্বারা [**সম্বত্সরঃ** = সম্বত্সর ইব নিয়মেন বর্ত্তমানঃ (বিদ্বজ্জনো জিজ্ঞাসুর্বা) (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ২৭.৪৫), সম্বত্সরো য়জ্ঞঃ প্রজাপতিঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.২.৫.১২), সম্বত্সরো য়জ্ঞঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১.২.৭.১) সম্বত্সরঃ সুবর্গো লোকঃ (তৈত্তেরীয় ব্রাহ্মণ ২.২.৩.৬; শতপথ ব্রাহ্মণ ৮.৪.১.২৪)] সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্বানগণ অনুশাসিত, সুসংগঠিত, ত্যাগী তথা তপস্বী হয়ে স্বর্গসদৃশ বাতাবরণ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। মনে রাখবেন যেকোনো রাষ্ট্র বা সমাজকে

সুখী অথবা দুঃখী বানানো বিদ্বান পণ্ডিতদের উপরই নির্ভর করে, কিন্তু তারসঙ্গে এটাও সত্য যে, যে রাষ্ট্রের বিদ্বান্ ত্যাগী, তপস্বী আর অনুশাসিত হওয়ার সাথে-সাথে পরস্পর সংগঠিত হয় না, তাহলে অপার পাণ্ডিত্য হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র নষ্ট হয়ে যায়, যেমনটা মহাভারত কালে দেখা গিয়েছিল। এই কারণে এখানে বিদ্বানদের ত্যাগী, তপস্বী, অনুশাসিত আর সংগঠিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

(**বিশ্বস্য**, **মিষতঃ**, **বশী**) রাজা তার রাষ্ট্রে জ্ঞান, বল আর ধন আদির দ্বারা পরস্পর স্পর্ধাকারী ব্যক্তিদের অথবা সংগঠনকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত বা সংযত করে। ব্যক্তিদের বা সংঘের মাঝে অনিয়ন্ত্রিত প্রতিস্পর্ধার কারণে মহাশক্তিশালী রাষ্ট্রও খণ্ড-খণ্ড হতে পারে। এই কারণে এখানে রাজাকে 'বশী' বলা হয়েছে। সেই রাজা সকলের বশী কিভাবে হয়, এর উত্তরে বলা হয়েছে –

(**অহোরাত্রাণি**, **বিদধত্**) [**অহোরাত্রাণি** = ব্রাহ্মণো বৈ রূপমহঃ ক্ষত্রস্য রাত্রিঃ (তৈত্তেরীয় ব্রাহ্মণ ৩.৯.১৪.৩), অহর্বৈ দেবা অক্ষয়ন্ত রাত্রিমসুরাঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৪.৫)। **অহন্** = অহর্বিদ্যা (তুলনা মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৫.৬)। **রাত্রি** = রাত্রিবিদ্যা (তুলনা মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৫.৬)] সেই রাজা তার রাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবী, উপদেশক আর অধ্যাপক বর্গ রূপী ব্রাহ্মণ এবং সৈনিক ও প্রশাসনিক অধিকারী ও কর্মচারী বর্গ রূপী ক্ষত্রিয় জনদের অহর্বিদ্যা ও রাত্রি-বিদ্যার দ্বারা বশ করে। যেকোনো সমুন্নত ও সুখী রাষ্ট্রে অথবা দুঃখী রাষ্ট্রে এই দুই বর্গের ভূমিকা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়। এই কারণে এই দুটো অনুশাসিত থাকা কোনো রাষ্ট্রের জন্য অনিবার্য হয়। অন্যদিকে কোনো রাষ্ট্র যেটা পূর্ণ আদর্শ নয়, তারমধ্যে দুই প্রকারের ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সংঘ হতে পারে, যারমধ্যে প্রথম দেবপুরুষ হয়, যারা সকলকে সঙ্গে নিয়ে পরোপকারের ভাবনার সাথে জীবনযাপন করে। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যক্তি হল তারা, যারা কেবল নিজের প্রাণ-

পোষণের জন্য জীবনযাপন করে। এই দুই প্রকারের ব্যক্তিদেরও রাজা তার এই বিদ্যা আর তাদের উপর আধারিত বিধানের দ্বারা রাষ্ট্রের অনুকূল বানায়।

এখন এখানে প্রশ্ন হল যে অহর্বিদ্যা আর রাত্রি বিদ্যা কি? এখানে মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্যের কথন উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক হবে – 'অগ্নির্বাऽহঃ সোমো রাত্রিঃ' (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.৪.৪.১৫)। এরদ্বারা এমন প্রতীত হয় যে অগ্নি অর্থাৎ বিদ্যুত্ আর ঊষ্মা আদি সম্বন্ধীয় বিদ্যাই অহর্বিদ্যা হয় এবং সোম অর্থাৎ বায়ু সম্বন্ধীয় বিদ্যাকে (ভেক্যুম এনার্জি সাইন্স) রাত্রি বিদ্যা বলা হয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞান অগ্নি বিদ্যার উপর তো কাজ করছে কিন্তু বায়ু বিদ্যার কোনো জ্ঞান তার নেই। যখন কোনো রাজা এই দুই বিদ্যার জ্ঞাতা হন, তখন তিনি সম্পূর্ণ রাজ্যকে সুরক্ষিত আর সুসংগঠিত রাখতে সক্ষম হন। একইসঙ্গে এর আরেকটা অর্থ এমনও হয় যে রাজা দেবপুরুষদের অর্থাৎ বিদ্বান, ধর্মাত্মা পুরুষদের নিজের দিব্য জ্ঞান দ্বারা বশ করেন অর্থাৎ নিজের অনুকূল তাদের করেন আর অসুর জনদের দণ্ড দিয়ে নিজের অনুকূল করেন।

এখানে 'অহন্' অর্থ ব্রাহ্মণ হওয়ার কারণে আমি 'জ্ঞানের প্রকাশ' এমন অর্থ করেছি আর 'রাত্রি'র অর্থ 'ক্ষত্রম্' হওয়ার কারণে 'দণ্ড' অর্থ করেছি।

ওম্ সূর্য়াচন্দ্রমসৌ ধাতা য়থাপূর্বমকল্পয়ত্ ।
দিবম্ চ পৃথিবীম্ চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥ [ঋগ্বেদ ১০.১৯০.৩]

আধিদৈবিক ভাষ্য

(**ধাতা**, **য়থাপূর্বম্**, **সূর্য়াচন্দ্রমসৌ**, **অকল্পয়ত্**) সবার ধারণ আর পোষণ-কারী কালতত্ত্ব সূর্য আর চন্দ্রমা অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশিত লোক আর সেগুলোর

দ্বারা প্রকাশিত অন্য লোকের রচনা পূর্ব সৃষ্টির অনুসারে করে। এর অর্থ হল সৃষ্টির নিয়ম সর্বদা অপরিবর্তিতই থাকে। এখানে 'পূর্বম্' পদ 'পূর্ব পূরণে' ধাতুর দ্বারাও ব্যুত্পন্ন মানা যেতে পারে। এই কারণে ঋষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ৪০.৪ ভাষ্যের মধ্যে 'পূর্বম্' পদের অর্থ 'পুরস্সরম্ পূর্বম্' করেছেন। এইভাবে এই মন্ত্রের এই ভাগের অর্থ এটাও হয় যে সেই কালতত্ত্ব আর তারও কাল পরব্রহ্ম পরমাত্মা সূর্য চন্দ্রাদি অসংখ্য লোককে যথোচিত আর বিজ্ঞানপূর্ণ ভাবে রচনা করেন। তাঁর রচনাতে কোথাও কোনো অপূর্ণতা বা ত্রুটির অবকাশ থাকে না।

(**দিবম্**, **চ**, **পৃথিবীম্**, **চ**, **অন্তরিক্ষম্**, **অথ**, **স্বঃ**) তিনিই দ্যুলোক এবং পৃথিবী লোকের রচনা করে সেই দুইয়ের মাঝে অন্তরিক্ষ লোককে বিস্তৃত করেন। এই ভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনেক লোকের নির্মাণ করে সেগুলোর মধ্যে একটা নিশ্চিত দূরত্ব বানিয়ে অন্তরিক্ষকে বিস্তৃত করেন। এই কারণে 'অন্তরিক্ষম্' পদের নির্বচনে মহর্ষি য়াস্কের কথন হল – 'অন্তরিক্ষম্ কস্মাত্? অন্তরা ক্ষান্তম্ ভবতি, অন্তরা ইমে ইতি বা।' (নিরুক্ত ২.১০) ধ্যাতব্য হল আগে দ্যুলোক এবং পৃথিবী লোক পরস্পর মিলিত থাকে, তৎপশ্চাৎ সেগুলোকে একে-অন্যের থেকে পৃথক করে নিশ্চিত কক্ষার মধ্যে স্থাপিত করা হয়েছে। এটাকেই এখানে অন্তরিক্ষ বিস্তৃত করা বলা হয়েছে।

এরপর সেই কাল এবং পরমাত্মা সবকিছু সমাপ্ত করে মহাপ্রলয়ে সম্পূর্ণ পদার্থকে লীন করে দেন। এই কারণে 'স্বঃ' বিষয়ে মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাসের কথন হল – 'অন্তো বৈ স্বঃ' ।(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫.২০)

আধ্যাত্মিক ভাষ্য

সবার ধারক সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হওয়া সূর্যাদি লোকের

এবং এগুলোর দ্বারা প্রকাশিত হওয়া চন্দ্রাদি লোকের রচনা ঠিক সেইভাবে করেন, যেভাবে তিনি পূর্ব সৃষ্টিতে করে এসেছেন। ধ্যাতব্য হল সৃষ্টি ও প্রলয়ের চক্র প্রবাহ থেকে অনাদি আর এই চক্রের মধ্যে যখনই যেসব পদার্থের সৃষ্টি হয়, তার ক্রিয়াবিজ্ঞান সর্বদা সমানই থাকে, কারণ ঈশ্বর হলেন সর্বজ্ঞ, এইজন্য তাঁর নিয়ম পূর্ণ আর অপরিবর্তনীয় হয়। তিনি পূর্বের মতোই দ্যুলোক, পৃথিবীলোক এবং অন্তরিক্ষ আদি লোকের নির্মাণ করেন। একইসঙ্গে তিনি মুমুক্ষদের পূর্বের মতোই মোক্ষ প্রদানকারী হন। তিনি সম্পূর্ণ সৃষ্টি সব লৌকিক আর পারলৌকিক সুখ প্রদান করার জন্যই রচনা করেন, এতে তাঁর নিজের কোনো প্রয়োজন নেই। এইজন্য মহর্ষি ব্যাস য়োগদর্শন ভাষ্যে লিখেছেন –

‘তস্যাত্মানুগ্রহাভাবে ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্।’

ভাবার্থ – এইসব মন্ত্রের জপ দ্বারা সাধক নিজের শরীর আর ইন্দ্রিয়কে পবিত্র আর বলবান্ বানানোর প্রার্থনার সঙ্গে-সঙ্গে ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণের উপরও চিন্তন করে। এই উপরোক্ত তিন মন্ত্রের জপ করার সময় সাধক সম্পূর্ণ সৃষ্টির সব ক্রিয়াকে নিজের মনের চক্ষু দিয়ে দেখে অনুভব করে। এরফলে তার সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতা আর বিশালতার যথাযথ বোধ হয়। সে সূক্ষ্ম কণার গতির সঙ্গে-সঙ্গে বিশাল-বিশাল লোকগুলোকে নিজের সম্মুখে নির্মিত হতে আর ঘূর্ণন ও পরিক্রমন করতে দেখে। কোটি-কোটি সংখ্যক লোকের নির্মাণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেক লোকে লক্ষ-লক্ষ প্রকারের প্রাণী ও বনস্পতিদের জন্মাতে আর মরতেও দেখে। সেই সাধক নিজের মনের চক্ষু দ্বারাই সৃষ্টির প্রলয়-প্রক্রিয়াকেও দেখে আর জানে। এর ভিতরে সে ঈশ্বরের মহতী শক্তির দ্বারা বড়-বড় লোক ও গ্যালাক্সিকে ভেঙে নষ্ট হতে দেখে, তারপর সেই সূক্ষ্ম কণাকেও বিখণ্ডন হয়ে রশ্মি, মন, অহংকার এবং প্রকৃতি আদিতে বিলীন হতে দেখে।

এইভাবে তার সম্পূর্ণ সৃষ্টি আর নিজের জীবনের নশ্বরতার স্পষ্ট বোধ হয় তথা জগতের প্রতি তার আসক্তি সমাপ্ত হয়ে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ নিতান্ত বেড়ে যায়। এইভাবে তার পাপ করার প্রবৃত্তি ধীরে-ধীরে সমাপ্ত হয়ে আত্মা উত্তরোত্তর পবিত্র হয়, এই কারণে এই মন্ত্রগুলোকে অঘমর্ষণ মন্ত্র বলা হয়েছে। সে ভূমি আদি লোক থেকে উৎপন্ন হওয়া বনস্পতি আর প্রাণীদেরও দেখে, এইসব প্রক্রিয়া দেখার সাথে সাথে সে নিজের ভিতরে সূক্ষ্ম আর স্থূল উভয় শরীরের রচনার উপর সূক্ষ্মতার সঙ্গে চিন্তন করে সর্বত্র পরমাত্মারই মহতী মহিমার অনুভব করে আর বলে ওঠে – **'অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্'**। এই প্রকারের অনুভূতির দ্বারা সাধক পরমেশ্বরের শক্তি ও জ্ঞানের সম্মুখে নতমস্তক হয়ে তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় ভরে যায় আর সে পরমেশ্বকে সৃষ্টির প্রত্যেক কণাতে সাক্ষাৎ অনুভব করতে থাকে। এই অনুভবের দ্বারা অভিভূত হয়েই অগ্রিম মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনা করে।

আধিভৌতিক ভাষ্য

(ধাতা, য়থাপূর্বম্) সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের ধারক আর পোষক উপরোক্ত গুণযুক্ত রাজা তার পূর্বকালে জন্মা মহান্ রাজাদের থেকে প্রেরিত হয়ে তাদেরই সদৃশ **(সূর্য়াচন্দ্রমসৌ, অকল্পয়ত্)** সূর্যের সমান তীক্ষ্ণ আর চন্দ্রমার সমান সৌম্য নীতির সম্পাদন করেন। একইসঙ্গে সূর্যের তেজস্বিনী কিরণ আর চন্দ্রমার শীতল কিরণের নানাবিধ ব্যবহার করে **(অথ, দিবম্, চ, পৃথিবীম্, চ, অন্তরিক্ষম্)** এর অনন্তর মহাকাশে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম দেব কণার বিজ্ঞান এবং ভূগর্ভ-বিজ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার করে **(স্বঃ)** প্রজার জন্য নানা প্রকারের সুখের সম্পাদন করেন।

এই তিন মন্ত্র থেকে রাজার যেসব গুণের প্রকাশ হয়েছে, তারদ্বারা এই সংকেত পাওয়া যায় যে বেদের দৃষ্টিতে রাজা সম্পূর্ণ সৃষ্টি বিদ্যা অর্থাৎ পরা এবং অপরা দুই প্রকারের বিদ্যার পূর্ণ জ্ঞাতা য়োগী হওয়া উচিত। এই বিষয়ে ভগবান্ মনুর কথন হল –

ব্রাহ্মম্ প্রাপ্তেন সম্স্কারম্ ক্ষত্রিয়েণ য়থাবিধি।
সর্বস্যাস্য য়থান্যায়ম্ কর্ত্তব্যম্ পরিরক্ষণম্ ॥ [মনুঃ ৭.২]

অর্থাৎ উচিত ন্যায় আর রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ সংরক্ষণ করার জন্য ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মীয় সংস্কার দ্বারা পূর্ণভাবে যুক্ত হওয়া অনিবার্য অর্থাৎ রাজা সম্পূর্ণ বেদবিদ্যার জ্ঞাতা এবং য়োগী হওয়া উচিত।

এই কারণে সন্ধ্যোপাসনাতে এই মন্ত্রগুলোর পূর্ণ সঙ্গতি আছে, কারণ উপাসনাবিহীন ব্যক্তি কখনোই রাজা হওয়ার অধিকারী হতে পারে না।

এই তিন মন্ত্র থেকে প্রেরণা নিয়ে সাধক সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে পরমাত্মার প্রসাদ মেনে সর্বদা নিষ্পাপ হওয়ার চেষ্টা করে অনাসক জীবনযাপন করার প্রচেষ্টা করবে। কারও ধন-সম্পত্তি, ঐশ্বর্য আর কামের আসক্তি ত্যাগ করার চেষ্টা করে সব ভূতের মধ্যে ঈশ্বরেরই দর্শন করবে।

আচমন-মন্ত্রঃ

ওম্ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ऽ আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শম্য়োরভি স্রবন্তু নঃ ॥ [য়জুর্বেদ ৩৬.১২]

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা আমি পূর্বে করেছি।

অঘমর্ষণ মন্ত্রের উপর বিচার করার পশ্চাৎ সাধক নিজের চারিদিকে সম্পূর্ণ সৃষ্টির প্রত্যেক কণাতে পরমাত্মার বিদ্যমানতার অনুভব করতে থাকে আর ঈশ্বরের প্রতি তার শ্রদ্ধা পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক বেড়ে যায়। এই কারণে সে 'অভিস্রবন্তু' পদ দ্বারা নিজের চারিদিকে বিদ্যমান পরমেশ্বরের কাছে সুখ, শান্তি আর পবিত্রতার বর্ষণ হওয়ার অনুভব করে। মন্ত্র সেটাই, অর্থও সেটাই, কিন্তু ঈশ্বরের বিষয়ে তার কিছু জ্ঞান আর অনুভব অধিক হওয়াতে তার ভাবের মধ্যে প্রগাঢ়তা আসে। সে অর্থের অনুভব অধিক গম্ভীরতার সঙ্গে করে। এই কারণে সে সুখ আর শান্তির অনুভব আরও অধিক গম্ভীর ভাবে করতে থাকে। এখানে এই মন্ত্রকে পুনরুক্ত করার প্রয়োজন হল এটাই। সে 'দেবী' আর 'আপঃ' পদের আধ্যাত্মিক অর্থকে পূর্বাপেক্ষা অধিক গম্ভীরতার সঙ্গে আত্মসাত্ করতে থাকে।

মনসা-পরিক্রমা-মন্ত্রাঃ

এইসব মন্ত্রের মধ্যে নক্ষত্র নির্মাণের প্রক্রিয়াকে দর্শানো হয়েছে আর যে বিশাল মেঘের সংঘনন দ্বারা কোনো নক্ষত্রের নির্মাণ হয়, তার কোন-কোন দিশাতে আর কোন-কোন ক্রমে কি-কি ক্রিয়া হয়, তার বর্ণনা এই মন্ত্রগুলোর মধ্যে করা হয়েছে।

দিশা হল আকাশ মহাভূতেরই বিশেষ ভাগ, এই কারণে এটা পদার্থ বিশেষের নাম হয়। এই দিক্ তত্ত্ব প্রত্যেক পদার্থকে চারিদিক থেকে ঘিরে থাকে। এটা বিভিন্ন প্রকারের ছন্দ রূপ প্রাণের দ্বারা নির্মিত হয়। এই ছন্দ রূপ প্রাণ খুবই সূক্ষ্ম হয়, যেটা প্রাণ নামক প্রাথমিক প্রাণ দ্বারা উৎপন্ন হয়। এইজন্য বলা হয়েছে – 'অথ য়ত্তচ্ছ্রোত্রমাসীত্তা ইমা দিশোऽভবন্' (তুলনা শতপথ

ব্রাহ্মণ ১০.৩.৩.৭)। এখানে বাক্ তত্ত্ব এবং বিশ্বামিত্র ঋষি অর্থাৎ প্রাণ নামক প্রাথমিক প্রাণই শ্রোত্র বলা হয়, এইজন্য বলা হয়েছে – 'শ্রোত্রম্ বৈ বিশ্বামিত্র ঋষির্যদেনেন সর্বতঃ শৃণোত্যথো য়দস্মৈ সর্বতো মিত্রম্ ভবতি তস্মাচ্ছ্রোত্রম্ বিশ্বামিত্র ঋষিঃ' (শতপথ ব্রাহ্মণ৮.১.২.৬), 'বাগিতি শ্রোত্রম্' (জৈমিনীয়োপনিষদ ব্রাহ্মণ ৪.১১.১.১১)। এখানে যে দিশাতে যে তত্ত্বের প্রাধান্য হয়, সেই তত্ত্বের প্রাধান্য সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, সম্পূর্ণ লোক-লোকান্তরে, বিভিন্ন পিণ্ডে, এমনকি সূক্ষ্ম কণার মধ্যেও নিজ-নিজ স্তরে বিদ্যমান হয়। দিক চিহ্নিত করতে সর্বত্র সূর্যের উদয় আর অস্তের জ্ঞান আবশ্যক নয়, বরং যেকোনো কণা বা লোকের তার অক্ষের উপর ঘূর্ণন দ্বারা দিশার নির্ধারণ সহজেই করা যেতে পারে। অদিতি, অগ্নি, সোম আর সবিতির বিদ্যমানতার পরীক্ষা করে দিশা চিহ্নিত করা অতি দুষ্কর কিংবা অসম্ভব কাজ হয়। সুতরাং ঘূর্ণনের দ্বারাই দিশার পরীক্ষা করা সবথেকে সরল উপায় হয়। দিক্ তত্ত্বের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত তথ্য হেতু 'বেদবিজ্ঞান–আলোকঃ' গ্রন্থের পূর্বপীঠিকা দ্রষ্টব্য।

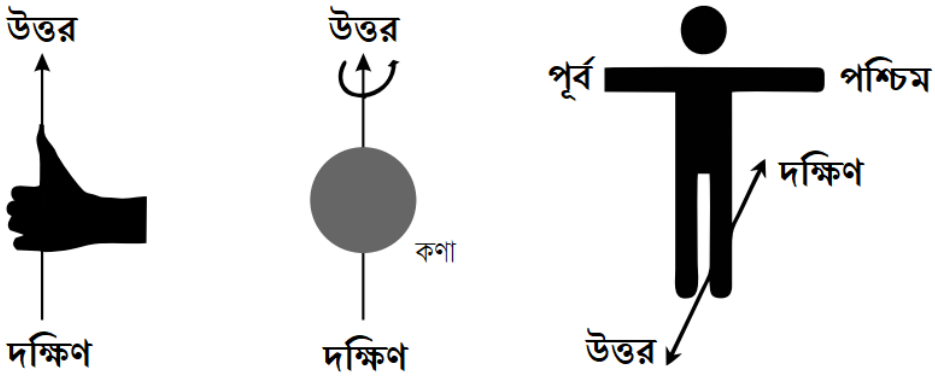

দক্ষিণ হস্ত নিয়মের অনুসারে বুড়ো আঙুলের দিশা উত্তর বলা হবে আর সেই দিশার সম্মুখে দাঁড়ালে ডান দিকে পূর্ব আর বাঁ দিকে পশ্চিম আর পিঠের দিশা দক্ষিণ বলা হবে। আঙ্গুলের দিশা সেই কণা বা লোকের স্ব অক্ষের উপর ঘূর্ণনের দিশা হবে।

ওম্ প্রাচী দিগগ্নিরধিপতিরসিতো রক্ষিতাদিত্যা ইষবঃ। তেভ্যো নমোऽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। য়ো৩স্মান্দ্বেষ্টি য়ম্ বয়ম্ দ্বিষ্মস্তম্ বো জম্ভে দধ্মঃ ॥

[অথর্ববেদ ৩.২৭.১]

এই মন্ত্রের ঋষি হল অথর্বা। এর অর্থ হল এই ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি অহিংসনীয় রশ্মি অর্থাৎ প্রাণ রশ্মি থেকে হয়। এর দেবতা হল অগ্নি ও আদিত্য। এর ছন্দ হল অষ্টি। এই কারণে এর দৈবত ও ছান্দস প্রভাব দ্বারা অগ্নির পরমাণু এবং সূর্যাদি লোক অত্যন্ত তীব্র আর ব্যাপক তেজ আর বল সম্পন্ন হতে থাকে।

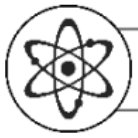

আধিদৈবিক ভাষ্য

(**প্রাচী, দিক্, অগ্নিঃ, অধিপতিঃ**) সেই বিশাল মেঘের পূর্ব ভাগে সর্বপ্রথম বিশেষ স্পন্দন প্রারম্ভ হয়। এরপর ঊষ্মার প্রাদুর্ভাব হতে থাকে, এইজন্য এখানে অগ্নিকে পূর্ব দিশার অধিপতি বলা হয়েছে, কারণ এটাই অন্য সব ক্রিয়ার নায়ক হয়। এখানে অগ্নি উৎপন্ন হওয়ার তাৎপর্য এই নয় যে সেই বিশাল মেঘের মধ্যে ঊষ্মা হয় না, কিন্তু এখানে এটুকুই তাৎপর্য যে এই ভাগের মধ্যে সর্বপ্রথম ঊষ্মাতেই বৃদ্ধি হতে থাকে অর্থাৎ সূর্যলোকের নির্মাণের প্রক্রিয়ার প্রারম্ভ এখন থেকেই হয়। এই কারণে মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাস ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (১.৭)মধ্যে বলেছেন – 'তস্মাদসৌ পুর উদেতি।' দিশার বিষয়ে এটাও জ্ঞাতব্য হয় যে দিক্ তত্ত্ব হল আকাশ তত্ত্বের মতোই সূক্ষ্ম রশ্মি দিয়ে তৈরি এক পদার্থ বিশেষ আর ভিন্ন-ভিন্ন দিশার মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন রশ্মি বিদ্যমান থাকে।

(**অসিতঃ, রক্ষিতা, আদিত্যাঃ, ইষবঃ**) [**ইষুঃ** = ঈষতের্গতিকর্মণো বধকর্মণো

বা (নিরুক্ত ৯.১৮) বীর্য় বাऽইষুঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.৫.২.১০)] অগ্নির এই সমৃদ্ধির প্রক্রিয়ার সংরক্ষক কে হয়, এমনটা বলার পরে লেখা আছে যে এইরকম রশ্মি, যেটা বন্ধনরহিত হয় বা অত্যল্প প্রকাশযুক্ত অথবা বর্ণহীন হয়, এই ঊষ্মা সমৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বল প্রদান করে। এখানে বন্ধনরহিত বিশেষণ এই বিষয়ের সংকেত করে যে সেই রশ্মিগুলো কোনো স্রোত বিশেষ দ্বারা নির্মিত নয় অর্থাৎ সেগুলো সেই ক্ষেত্রে সর্বত্রই উৎপন্ন হতে থাকে। এই আদিত্য রশ্মিগুলো বজ্রেরও কাজ করে, এইজন্য এগুলো সংঘনন প্রক্রিয়াতে বাধক হওয়া অসুরাদি পদার্থকে নষ্ট বা নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। তা নাহলে সংঘননের প্রক্রিয়া তো প্রারম্ভই হবে না অথবা প্রারম্ভ হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। এইজন্য এই রশ্মিকে রক্ষিতা বলা হয়েছে।

(তেভ্যঃ, নমঃ, অধিপতিভ্যঃ, নমঃ, রক্ষিতৃভ্যঃ, নমঃ, ইষুভ্যঃ, নমঃ, এভ্যঃ, অস্তু) [**নমঃ** = বজ্রনাম (নিঘন্টু ২.২০), অন্ননাম (নিঘন্টু ২.৭), য়জ্ঞো বৈ নমঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.৪.২.২৪), অন্নম্ নমঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.৩.১.১৭)] এই ছন্দ রশ্মির কারণভূত প্রাণ রশ্মিগুলো এইসব পদার্থের জন্য নমোরূপ হয়। সেই প্রাণ রশ্মিগুলো এইসব প্রক্রিয়ার অধিপতি বা নায়করূপ অগ্নির জন্য, রক্ষক আর ইষুরূপ আদিত্য রশ্মির জন্য অর্থাৎ এইসবের জন্য নমোরূপ হয়। এখানে নমোরূপ দ্বারা নিম্নানুসারে অর্থ প্রকট হয় –

১. প্রাণ রশ্মিগুলো এইসবের দিকে ঝুকে সেগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তেজ, বল আর প্রেরণা প্রদান করে।

২. প্রাণ রশ্মিগুলো এইসব পদার্থের জন্য অন্নরূপ হয় অর্থাৎ এইসব পদার্থ সেই প্রাণ রশ্মির ভক্ষণ বা অবশোষণ করে অধিক সক্রিয় বা সবল হয়ে যায়।

৩. সেই প্রাণ রশ্মিগুলো এইসব পদার্থের জন্য য়জনরূপ হয়। এর অর্থ হল এই প্রাণ রশ্মির প্রভাবে এইসব পদার্থ য়জনশীল হয়ে সংযোগ-বিয়োগের প্রক্রিয়াকে

সমৃদ্ধ করতে থাকে।

৪. সেই প্রাণ রশ্মিগুলো এইসব পদার্থের জন্য বজ্ররূপ হয় অর্থাৎ সেগুলো এই সব পদার্থকে অনিষ্ট অসুরাদি পদার্থের সঙ্গে যুক্ত করে য়জন কর্মের জন্য এই পদার্থকে থামিয়ে রাখে। এর অর্থ হল এগুলো য়জন প্রক্রিয়া থেকে বিমুখ হওয়া পদার্থকে য়জন ক্রিয়াতে নিযুক্ত করতে সহায়ক হয়।

(**য়ঃ, অস্মান্, দ্বেষ্টি, য়ম্, বয়ম্, দ্বিষ্মঃ, তম্, বঃ, জম্ভে, দধ্মঃ**) যে পদার্থ প্রাণ রশ্মির প্রতি আকর্ষণ ভাব রাখে না আর যেসব পদার্থের প্রতি প্রাণ রশ্মিরও আকর্ষণ ভাব হয় না, এমন সেইসব বাঁধক অসুর পদার্থকে এই প্রাণ রশ্মিগুলো এই অগ্নি, আদিত্য আদি পদার্থের বজ্ররূপ রশ্মির মুখরূপ অগ্রভাগের দিকে প্রক্ষিপ্ত করে দেয় অর্থাৎ এই বজ্র রশ্মির সেই ভাগ যা অসুর রশ্মির উপর সরাসরি প্রহার করে, সেই ভাগগুলোর মধ্যে অসুর রশ্মিকে স্থাপিত করে দেয়, যারফলে সেইসব অসুর রশ্মি নষ্ট হয়ে যায়।

আধ্যাত্মিক ভাষ্য

(**প্রাচী, দিক্, অগ্নিঃ, অধিপতিঃ, অসিতঃ, রক্ষিতা, আদিত্যাঃ, ইষবঃ**) সর্বপ্রথম সাধক প্রাচী অর্থাৎ নিজের সম্মুখ দিশার দিকে মনকে নিয়ে গিয়ে অগ্নি-স্বরূপ পরমাত্মার অস্তিত্বকে অনুভবের চেষ্টা করে। 'অগ্নি' পদের বিষয়ে মহর্ষি য়াস্কের কথন হল –

'অগ্নিঃ কস্মাদগ্রণীর্ভবতি। অগ্রম্ য়জ্ঞেষু প্রণীয়তে।

অঙ্গম্ নয়তি সন্নমমানঃ।' (নিরুক্ত ৭.১৪)

অর্থাৎ সেই অগ্নিস্বরূপ পরমাত্মা এই সৃষ্টিতে বল এবং জ্ঞানাদি গুণের দৃষ্টিতে সবথেকে অগ্রণী হন। সৃষ্টিযজ্ঞের জন্য সর্বপ্রথম কামনা ঈশ্বরের মধ্যেই উৎপন্ন

হয় আর সেই ঈশ্বরকেই সৃষ্টিযজ্ঞের প্রথম হোতা বলা হয়। সেই ঈশ্বর নিজের সানিধ্যকে প্রাপ্ত সাধকদের নিজের অঙ্গ বানিয়ে নেন অর্থাৎ যে ভক্ত ঈশ্বারাধীন হয়ে সংসারে জীবনযাপন করে, সেই মুমুক্ষুদের সেই পরমাত্মা মোক্ষ প্রদান করেন। এই কারণে সম্মুখ দিশাতে ধ্যান যাওয়াতে সেই সাধক এমন অগ্নিস্বরূপ পরমাত্মাকেই অনুভব করে আর তাঁকেই নিজের নায়ক মেনে নিজের সর্বস্ব সমর্পিত করার ভাবনা করে। এখানে 'আদিত্য' পদ দ্বারা সে পরমাত্মাকে অবিনাশী অনুভব করে সর্বদা নিজের ইষু অর্থাৎ প্রেরক মানতে থাকে আর তাঁরই নির্দেশানুসারে নিজের বৃত্তিকে পবিত্র করার চেষ্টা করে। ইষুর বিষয়ে মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্যের কথন হল – 'ইষবো বৈ দিদ্যবঃ' (শতপথ ব্রাহ্মণ ৫.৪.২.২)। এরদ্বারা ইষুর অর্থ দীপ্তি বা প্রকাশ সিদ্ধ হয়। এইভাবে আদিত্যরূপ পরমাত্মা তাঁর জ্ঞানের প্রকাশ দ্বারা নিরন্তর আমাদের সত্ পথে প্রেরিত করেন। এমন অনুভব সাধক নিজের সম্মুখ দিশাতে করে। এখানে 'অসিতঃ' পদের অর্থ হল সেই পরমাত্মা কারও বন্ধনে থাকেন না, বরং তিনি সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন হওয়ার কারণে সর্বদা স্বতন্ত্র হন। সেই সাধক এই দিশাতে অগ্নি আর আদিত্যরূপ পরমাত্মাকে নিজের রক্ষক অনুভব করে স্বয়ংকে নির্ভয় অনুভব করতে থাকে।

(**তেভ্যঃ**, **নমঃ**, **অধিপতিভ্যঃ**, **নমঃ**, **রক্ষিতৃভ্যঃ**, **নমঃ**, **ইষুভ্যঃ**, **নমঃ**, **এভ্যঃ**, **অস্তু**) এইভাবে অগ্নি, আদিত্য আর রক্ষক আদি গুণযুক্ত সেইসবের প্রতি সাধক নম্রীভূত হয়ে যায়। সে এইসব গুণযুক্ত অধিপতি-রূপ, রক্ষকরূপ এবং প্রেরক আর মার্গদর্শক রূপ পরমাত্মাকে বারংবার নমন করে। এইভাবে এই দিশাতে শ্রদ্ধা পূর্ণভাবে প্রার্থনা করে –

(**য়ঃ**, **অস্মান্**, **দ্বেষ্টি**, **য়ম্**, **বয়ম্**, **দ্বিষ্মঃ**, **তম্**, **বঃ**, **জম্ভে**, **দধ্মঃ**) হে ঈশ্বর! এই দিশাতে যে আমাকে দ্বেষ করে বা আমার মনে কারও প্রতি কোনো দ্বেষ-

ভাব আছে, তাকে আমি আপনার দ্বেষনাশক শক্তিকে সমর্পণ করছি, যাতে আপনি আমার অথবা আমাকে দ্বেষকারীর দ্বেষকে নষ্ট করে সবার হৃদয়ে প্রীতি উৎপন্ন করেন। এমন প্রার্থনা করার সময় সাধক নিজের ভিতরে লুকিয়ে থাকা দ্বেষভাবকে খুঁজে-খুঁজে বাইরে বের করে সবার প্রতি প্রীতির ভাব উৎপন্ন করে।

আধিভৌতিক পক্ষ

এখানে এই মন্ত্রগুলোর মধ্যে একজন রাজার গুণ ও তার কর্তব্যের বর্ণনা করা হয়েছে। যেকোনো রাজার রাষ্ট্রে সময়-সময়ে ভিন্ন-ভিন্ন পরিস্থিতি উৎপন্ন হতে পারে। অনেক ধরণের সমস্যা উৎপন্ন হতে পারে। সেগুলোর সমাধান করে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রকে সুখী ও সমৃদ্ধি বানানো কেবল রাজারই কর্তব্য হয় না আর না কেবল একলা রাজা অথবা তার রাজ্য বিনা কোনো জনের সহায়তায় কোনো রাষ্ট্রকে সুখী আর সমৃদ্ধি বানাতে পারবে। এই মন্ত্রগুলোর মধ্যে এই বিষয়ের বিবেচনা করা হয়েছে।

আধিভৌতিক ভাষ্য

(**প্রাচী, দিক্, অগ্নিঃ, অধিপতিঃ, অসিতঃ, রক্ষিতা, আদিত্যাঃ, ইষবঃ**) বিদ্বান্ রাজা প্রাচী অর্থাৎ ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রোৎথান হেতু অগ্রগামী নায়কদের জন্য অগ্নিস্বরূপ হওয়া উচিত। যেভাবে অগ্নি সবার অগ্রণী হয়ে সবাইকে নিজের সাথে নিয়ে যায় আর প্রত্যেক সঙ্গতিকরণের প্রক্রিয়াতে সেটাই অগ্রণী হয়ে সবাইকে নিজের মতো বানিয়ে নেয়, তেমনি রাজারও উচিত যে তিনি সেই অগ্রগামী নায়কদের মহানায়ক হয়ে তাদের সবাইকে সংগঠিত করবেন। এই কর্মে সহযোগিতা ও প্রেরণার জন্য বন্ধনরহিত অর্থাৎ সমস্ত এষণা থেকে মুক্ত তথা আদিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যপূর্বক পূর্ণ বিদ্যা প্রাপ্ত আপ্তপুরুষ প্রেরক আর

রক্ষকের কর্ম করবেন। যদি কোথাও কোনো নায়কের মধ্যে ন্যুনতা বা প্রমাদ আসার আশঙ্কাও হয়, তাহলে এই বিদ্বান্ তাদের মার্গদর্শক হয়ে তাকে দূর করার চেষ্টা করবেন।

(**তেভ্যঃ**, **নমঃ**, **অধিপতিভ্যঃ**, **নমঃ**, **রক্ষিতৃভ্যঃ**, **নমঃ**, **ইষুভ্যঃ**, **নমঃ**, **এভ্যঃ**, **অস্তু**) এমন অধিপতিরূপ মহানায়কের সম্মান সবার করা উচিত। এমন রক্ষক আর প্রেরক আপ্ত বিদ্বানদের অন্ন, বস্ত্র আদি দ্বারা সম্মান করা উচিত, তারা যেন কোনোভাবে দুঃখী না হতে পারে। এমন সব নায়ক পরস্পর সংগঠিত হয়ে চলবে, তা নাহলে তারা রাষ্ট্রোত্থানে নিজের লক্ষ্যে সফল হতে পারবে না। এইজন্য ঋগ্বেদে বলা হয়েছে – **'সম্গচ্ছধ্বম্ সম্বদধ্বম্'**

(**য়ঃ**, **অস্মান্**, **দ্বেষ্টি**, **য়ম্**, **বয়ম্**, **দ্বিষ্মঃ**, **তম্**, **বঃ**, **জম্ভে**, **দধ্মঃ**) এইসব নায়কের সঙ্গে যদি কোনো নাগরিক দ্বেষ করে অথবা এদের মধ্যে পরস্পর বা অন্য কোনো নাগরিকের সঙ্গে যদি কোনো দ্বেষভাব হয়, তাহলে সেই দ্বেষ-ভাবকে সমদর্শী রাজার ন্যায়-ব্যবস্থাতে সমর্পণ করা উচিত, যাতে সম্পূর্ণ দ্বেষ-ভাব নষ্ট হয়ে পরস্পর প্রীতির পরিবেশ হয়।

ওম্ দক্ষিণা দিগিন্দ্রোऽধিপতিস্তিরশ্চিরাজী রক্ষিতা পিতর ইষবঃ। তেভ্যো নমোऽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। য়োঽস্মান্দ্বেষ্টি য়ম্ বয়ম্ দ্বিষ্মস্তম্ বো জম্ভে দধ্মঃ ॥

[অথর্ববেদ ৩.২৭.২]

এই মন্ত্রের ঋষি হল অথর্বা। এর দেবতা হল ইন্দ্র আর পিতর। এর ছন্দ হল অষ্টি। এই কারণে এর দৈবত আর ছান্দস প্রভাবে [**ইন্দ্রঃ** = অথ য়ত্রৈতত্ প্রদীপ্তো ভবতি। উচ্চৈর্ধূমঃ পরময়া জূত্যা বল্বলীতি তর্হি হৈষ (অগ্নিঃ) ভবতীন্দ্রঃ

(শতপথ ব্রাহ্মণ ২.৩.২.১১)। **পিতরঃ** = ঊষ্মভাগা হি পিতরঃ (তৈত্তেরীয় ব্রাহ্মণ ১.৩. ১০.৬) অনহতপাপ্মানঃ পিতরঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ২.১.৩.৪)] ইন্দ্র তত্ত্ব অথবা ধূম্র এবং জ্বালাযুক্ত প্রচণ্ড অগ্নি এবং ঊষ্মাযুক্ত কণা আদি পদার্থ এই দিশার সম্পূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হতে থাকে।

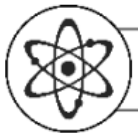

আধিদৈবিক ভাষ্য

(**দক্ষিণা, দিক্, ইন্দ্রঃ, অধিপতিঃ, তিরশ্চিরাজিঃ, রক্ষিতা, পিতর, ইষবঃ**) পূর্বোক্ত বিশাল কোস্মিক মেঘের দক্ষিণ ভাগে ইন্দ্র তত্ত্বের প্রবলতা হয় আর সেই ইন্দ্রই সব ক্রিয়ার নিয়ামক বা সঞ্চালক হয়। মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্যের উপরোক্ত বচনানুসারে এখানে ধূমযুক্ত তীব্র বেগবান্ প্রদীপ্ত অগ্নিকেই বিদ্যুত্ বলা হয়েছে। এর অর্থ হল সেই মেঘের দক্ষিণভাগে ধূমযুক্ত তীব্র অগ্নি প্রজ্বলিত হতে থাকে আর সেখানে বিদ্যমান পদার্থ তীব্র ঊষ্মাযুক্ত হওয়ার কারণে পাতক অসুরাদি পদার্থ থেকে মুক্ত হতে থাকে আর সেইসব ঊষ্মাযুক্ত কণা সেই ক্ষেত্রের মধ্যে আঁকা-বাঁকা অনিয়মিত গতি যুক্ত হতে থাকে। এই তির্যক গতি যুক্ত তীব্র বেগবান্ কণা এই ক্ষেত্রের মধ্যে ইষু অর্থাৎ বজ্রের কর্ম করে। এই কারণে এর তীব্র প্রবাহে অসুরাদি বাঁধক রশ্মি থেকে এই ক্ষেত্রের পদার্থের রক্ষা হয়। এই কারণে এদের রক্ষক বলা হয়েছে। এই বিষয়ে মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাস লিখেছেন – **‘য়দগ্নিঃ য়জতি তস্মাদ্ দক্ষিণতোऽগ্র’** (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১.৭)।

(**তেভ্যঃ, নমঃ ... জন্তে, দধ্মঃ**) পূর্ববত্।

আধ্যাত্মিক ভাষ্য

(**দক্ষিণা, দিক্, ইন্দ্রঃ, অধিপতিঃ, তিরশ্চিরাজিঃ, রক্ষিতা, পিতর,**

ইষবঃ) এখন সাধক নিজের মনকে দক্ষিণ দিশাতে নিয়ে যায়। [**দক্ষিণা** = দক্ষিণো হস্তো, দক্ষতেরুত্সাহকর্মণঃ (নিরুক্ত ১.৭)] প্রায়শঃ দক্ষিণ হস্তই অধিক বলবান্ হয়, যেমনটা তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে বলা হয়েছে – 'দক্ষিণো বা অর্থ আত্মনো (শরীরস্য) বীর্য়বত্তরঃ' (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ৫.১.১৩) অন্যদিকে ইন্দ্রকে বলপতি বলা হয়েছে। এই কারণে দক্ষিণ দিশাতে সাধক ইন্দ্ররূপ পরমাত্মাকে নিজের অধিপতি অনুভব করে। সে অনুভব করে যে সেই পরমাত্মা পরম ঐশ্বর্যবান্ হয়ে সম্পূর্ণ সৃষ্টির উপর শাসন করছেন। [**পিতরঃ** = প্রাণো বৈ পিতা (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.৩৮), পিতরঃ প্রজাপতিঃ (গোপথ ব্রাহ্মণ উত্তরভাগ ৬.১৫)]

এই দিশাতে সে সম্পূর্ণ প্রজার পালক প্রাণতত্ত্ব, যার গতি অতি তীব্র, তাঁকে নিজের রক্ষক অনুভব করে। এইভাবে সেই সাধক বলপতি ইন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত অব্যক্ত গতিশীল প্রাণ তত্ত্বকে নিজের প্রেরক ও রক্ষক অনুভব করতে থাকে। এইভাবে সে দক্ষিণ দিশা থেকে নিজের শরীরের মধ্যে প্রাণের বল সঞ্চার হতেও অনুভব করে। সে বলবত্তম ইন্দ্র পরমাত্মাকে অনুভব করে তাঁর আশ্রয়ে স্বয়ংকে অভয় আর সুরক্ষিত অনুভব করে।

(**তেভ্যঃ**, **নমঃ ... জম্ভে**, **দধ্মঃ**) পূর্ববত্।

আধিভৌতিক ভাষ্য

(**দক্ষিণা**, **দিক্**, **ইন্দ্রঃ**, **অধিপতিঃ**, **তিরশ্চিরাজিঃ**, **রক্ষিতা**, **পিতর**, **ইষবঃ**) [**দক্ষিণা** = ঘোরা বা এষা দিগ্দক্ষিণা শান্তা ইতরাঃ (গোপথ ব্রাহ্মণ পূর্বভাগ ১.২.১৯)] যদি রাষ্ট্রের কোনো ভাগে অশান্তি এবং উপদ্রব হয়, তখন রাজার উচিত ইন্দ্ররূপ হয়ে দণ্ডরূপী বল দ্বারা স্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রচেষ্টা করা। দণ্ডের বিষয়ে ভগবান্ মনুর কথন হল –

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্বাঃ, দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্তি, দণ্ডম্ ধর্মম্ বিদুর্বুধাঃ ॥ [মনুস্মৃতি ৭.১৮]

ধ্যাতব্য হল কেবল দণ্ডের বলে রাষ্ট্রের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা অশান্তি বা অরাজকতা দূর হয়ে যাবে, এটা আবশ্যক নয়। এর জন্য অন্য উপায় রূপে পিতরগণ গুপ্ত বা শান্ত রূপে সকলকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন, এটা অনিবার্য। এখানে পিতরের তাৎপর্য অসামাজিক তত্ত্বের মাতা-পিতা, অন্য বয়োবৃদ্ধ সম্বন্ধীজন আর গুরুজন আদির সাথে-সাথে ধর্মোপদেশক, সমাজসেবী, কৃষক, সৈনিক আদি সকলে মিলে তাদের হবে, তবেই রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা হতে পারে।

(**তেভ্যঃ**, **নমঃ ... জন্তে**, **দধ্মঃ**) পূর্ববত্।

ওম্ প্রতীচী দিগ্বরুণোऽধিপতিঃ পৃদাকূ রক্ষিতান্নমিষবঃ। তেভ্যো নমোऽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। য়োঽস্মান্দ্বেষ্টি য়ম্ বয়ম্ দ্বিষ্মস্তম্ বো জন্তে দধ্মঃ ॥

[অথর্ববেদ ৩.২৭.৩]

এই মন্ত্রের ঋষি হল অথর্বা। এর দেবতা হল বরুণ এবং পৃদাকু-অন্নম্। এর ছন্দ হল অষ্টি। এর দৈবত আর ছান্দস প্রভাবে বরুণ আদি পদার্থ, যার ব্যাখ্যা মন্ত্রের ভাষ্যতে করা হবে, তীব্র এবং ব্যাপক বলযুক্ত হতে থাকে। একইসঙ্গে এই পদার্থ স্বয়ংও দূরে-দূরে ব্যাপ্ত হতে থাকে।

[**বরুণঃ** = বরুণো বৈ সোমঃ। (কাঠক ২৪.৬; কপিষ্ঠল সংহিতা ৩৭.৫), ক্ষেত্রম্ বৈ বরুণঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.৫.২.৬), ক্ষত্রম্ সোমঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.৩৮)। **পৃদাকুঃ** = পর্দতে কুত্সিতম্ শব্দম্ করোতীতি পৃদাকুঃ (উণাদি কোষ ৩.৮০)]

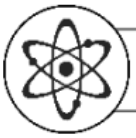

আধিদৈবিক ভাষ্য

(**প্রতীচী**, **দিক্**, **বরুণঃ**, **অধিপতিঃ**, **পৃদাকুঃ**, **রক্ষিতা**, **অন্নম্**, **ইষবঃ**) পূর্বোক্ত খগোলীয় বিশাল মেঘের পশ্চিম দিশাতে বরুণ নামক পদার্থ অধিপতির কর্ম করে অর্থাৎ এই পদার্থই এই ভাগে আধিনায়ক রূপ হয়। এখানে উপরোক্ত বচন 'বরুণো বৈ সোমঃ' এই বিষয়ের সংকেত করে যে বরুণ নামক পদার্থ সোম নামক পদার্থেরই কোনো রূপ হয়, যা তীব্র ভেদক শক্তি সম্পন্ন হয়। এর তীব্র বলই এই ক্ষেত্রের মধ্যে সম্পন্ন হবে এমন সব ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত আর সংরক্ষিত করে। বিভিন্ন প্রকারের সংযোজ্য কণা ইষু অর্থাৎ বজ্ররূপ হয়, যা বরুণ নামক পদার্থ দ্বারা প্রেরিত হয়ে অনেক প্রকারের অনিষ্ট পদার্থকে নষ্ট করতে থাকে। তাদের এই গুণের কারণেই সেগুলোকে এই ক্ষেত্রের রক্ষক বলা হয়েছে।

এইসব ক্রিয়াতে প্রচণ্ড শব্দকারী বরুণ অর্থাৎ সোমের বিষয়ে মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাসের কথন হল – য়ত্সোমম্ য়জতি তস্মাত্ প্রতীচ্যোऽ প্যাপো বহ্বয়ঃ স্যন্দন্তে সোমা হ্যাপাঃ' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১.৭) এখানেও পশ্চিম দিশার সম্বন্ধ সোম দর্শানো হয়েছে, যা এখানে বরুণ রূপে বিদ্যমান আছে।

(**তেভ্যঃ**, **নমঃ ... জন্তে**, **দধ্নঃ**) পূর্ববত্।

আধ্যাত্মিক ভাষ্য

(**প্রতীচী**, **দিক্**, **বরুণঃ**, **অধিপতিঃ**, **পৃদাকুঃ**, **রক্ষিতা**, **অন্নম্**, **ইষবঃ**) তারপর সাধক তার মনকে তার পৃষ্ঠ ভাগে নিয়ে যায় আর সেখানে বরুণ অর্থাৎ বরণ করার যোগ্য তথা নিজের ভক্তকে বরণকারী পরমাত্মার বিদ্যমানতা অনুভব

করে। মনে রাখবেন, অনেক বস্তুর মধ্যে একটা বস্তুকে বরণ করার সময় যেকোনো ব্যক্তি নিজের জ্ঞানের অনুসারে সর্বশ্রেষ্ঠকেই চয়ন করে। এই কারণে সে পৃষ্ঠ ভাগে বিদ্যমান সব পদার্থের মধ্যে পরমাত্মার শ্রেষ্ঠত্বকে অনুভব করে। যেভাবে কোনো ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুর বরণ করে আনন্দের অনুভব করে, ঠিক সেইভাবে পিছনের দিশাতে সে সেই পরমাত্মাকে বরণ করে আনন্দের অনুভব করে। এর সাথে-সাথে সে এটাও অনুভব করে যে সেই পরমাত্মাও আমাকে বরণ করে নিয়েছেন আর তিনিই তার নায়ক হয়ে আছেন।

[**অন্নম্** = অন্নম্ কস্মাত্। আনতম্ভূতেভ্যঃ, অত্তের্বা। (নি.৩.৯) এখানে 'পৃদাকুঃ' পদের অর্থ 'পৃদাকোর্নাশকঃ' অর্থাৎ কুৎসিত বিচারের ও কুসংস্কারের নাশকারী হয়।] সেই পরমাত্মা অন্নরূপ হয়ে অর্থাৎ যেভাবে অন্নকে সব প্রাণী চায় আর সেই দিকেই ছুটে যায়, ঠিক সেইভাবে সব বিবেকশীল মানুষ ঈশ্বরকেই প্রাপ্ত করার প্রচেষ্টা করে আর তাঁর থেকে বল প্রাপ্ত করে। এইরূপ সেই পরমাত্মা পৃদাকু অর্থাৎ কুৎসিত বিচার আর কুসংস্কারকে নষ্ট করে সেইসব থেকে রক্ষা করেন। এখানে অন্নের সঙ্গে বরুণের সঙ্গতি আছে, যেভাবে ক্ষুধায় আতুর ব্যক্তি অন্নের বরণ করে, সেই ভাবে প্রত্যেক মুমুক্ষুও বরুণ রূপ পরমাত্মার বরণ করে।

(**তেভ্যঃ**, **নমঃ ... জন্তে**, **দধ্মঃ**) পূর্ববত্।

আধিভৌতিক ভাষ্য

(**প্রতীচী**, **দিক্**, **বরুণঃ**, **অধিপতিঃ**, **পৃদাকুঃ**, **রক্ষিতা**, **অন্নম্**, **ইষবঃ**)
[**প্রতীচী** = প্রতিকূলম্ বর্ত্তমানাঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৩.১৮.১)] যখন কোথাও রাষ্ট্রের নাগরিক রাষ্ট্রের হিতের প্রতিকূল ব্যবহার করবে, তখন রাজার উচিত যে তিনি বরুণরূপ হয়ে তাদের আধিপত্য করবেন। এর অর্থ হল রাজার

ব্যবহার দ্বারা সেই প্রতিকূলগামী নাগরিক এমন অনুভব করবে যে তাদের জন্য রাজার আদেশই বরণীয় হবে। এরসঙ্গে সেই নাগরিকদের ব্যবহার না শোধরালে রাজা তাদের কারাগারে বন্ধি করবেন। এই কাজে সহযোগের জন্য [**পৃদাকুঃ** = পৃ (পালনম্) + দা (দানম্) + কুঃ (করোতীতি) (প্রো০ বিশ্বনাথ বিদ্যালঙ্কার – অথর্ববেদ ভাষ্যম্)] সবার পালক আর রাষ্ট্র যজ্ঞে ধনাদির দানকারী বৈশ্য জনও প্রেরক আর রক্ষক হয়ে এই কাজে রাজার সহায়ক হবে। ধ্যাতব্য হল, কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য চারটা উপায় বলা হয়েছে – সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ। এরমধ্যে সাম আর দান হল সর্বোত্তম আর সাত্ত্বিক উপায়। যদি রাষ্ট্রের ব্যবসায়ী, উদ্যোগপতি ও কৃষক সমন্বিত রূপে এই কাজে রাজার সহায়তা করে, তাহলে কুমার্গগামী নাগরিকদের সুমার্গে নিয়ে আসতে কঠিন হবে না। এর কারণ হল অভাবগ্রস্থ এবং শোষিত নাগরিকই কুমার্গগামী হয়ে যায়। কেউ এরজন্য ঠিকই বলেছেন যে – 'বুভুক্ষিতঃ কিম্ ন করোতি পাপম্।'

ওম্ উদীচী দিক্সোমোऽধিপতিঃ স্বজো রক্ষিতাশনিরিষবঃ। তেভ্যো নমোऽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। য়োঽস্মান্দ্বেষ্টি য়ম্ বয়ম্ দ্বিষ্মস্তম্ বো জম্ভে দধ্মঃ ॥

[অথর্ববেদ ৩.২৭.৪]

এই মন্ত্রের ঋষি অথর্বা ও ছন্দ অষ্টি। এর দেবতা সোম ও অশনি হওয়াতে এর দৈবত আর ছান্দস প্রভাবে সোম নামক পদার্থ এই সম্পূর্ণ ক্ষেত্রে নিজের ব্যাপক বল দ্বারা ব্যাপ্ত হতে থাকে। একইসঙ্গে এই ক্ষেত্রে বিদ্যুতের বিশেষ বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ এই দিশাতে বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যুদাবেশিত কণা প্রভূত মাত্রায় বিদ্যমান থাকে।

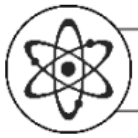

আধিদৈবিক ভাষ্য

(**উদীচী**, **দিক্**, **সোমঃ**, **অধিপতিঃ**, **স্বজঃ**, **রক্ষিতা**, **অশনিঃ**, **ইষবঃ**) সেই বিশাল পিণ্ডের উত্তর ভাগে সোম নামক পদার্থ অধিপতি রূপে থাকে। [**সোমঃ** = সোমো বা ইন্দ্রঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.২.৩.২৩), দ্যাবাপৃথিব্যোর্বা এষ গর্ভো য়ত্সোমো রাজা(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ১.২৬),হবির্বৈ দেবানাম্ সোমঃ(শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.৫.৩.২), সর্বম্ হি সোমঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৫.৫.৪.১১), বৈরাজঃ সোমঃ (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ৯.৬)] এর অর্থ হল এই সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে সোম পদার্থ ভারী মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এই কারণে সোমপা ইন্দ্র অর্থাৎ তীব্র বিদ্যুৎ তরঙ্গ বিশেষ রূপে ঋণাবেশিত তরঙ্গ প্রচুর মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। একইসঙ্গে বৈরাজ সাম রূপ 'পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা য়ম্ তে সুষাব হর্য়শ্বাদ্রিঃ। সোতুর্বাহুভ্যাম্ সুয়তো নার্বা।।' (ঋগ্বেদ ৭.২২.১) ছন্দ রশ্মিরও সেখানে প্রাধান্য হয়, যার প্রভাবে ইন্দ্র তত্ত্ব সোম পদার্থকে অবশোষিত করে প্রবল হয়ে আবেশিত কণার মেঘের নির্মাণ করতে থাকে। এই কারণে এই ক্ষেত্রে ইন্দ্র রূপ সোম পদার্থ বা সোমপা ইন্দ্র অধিপতির কাজ করে। এই ক্ষেত্রে বিদ্যুতের তীব্রধারা প্রবাহিত হতে থাকে। এই তীব্র ধারা এখানে ইষু অর্থাৎ বজ্র রশ্মির কাজ করে। এই বিদ্যুৎ ধারা 'সু+অজঃ' অর্থাৎ অনিষ্ট পদার্থকে ভালো ভাবে প্রক্ষিপ্ত করতে সক্ষম এবং তীব্র গতি সম্পন্ন হয়। এই কারণে এগুলোকে এখানে রক্ষিতা বলা হয়েছে। এই বিষয়ে মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাসের কথন হল – 'সবিতারম্ য়জতি। য়ত্সবিতারম্ য়জতি তস্মাদুত্তরতঃ পশ্চাদয়ম্ ভূয়িষ্ঠম্ পবমানঃ পবতে সবিতৃপ্রসূতো হ্যেষ এতত্পবতে'। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১.৭) এখানেও উত্তর দিশার সম্বন্ধ বিদ্যুৎ রূপ সবিতার সঙ্গে দর্শানো হয়েছে।

(**তেভ্যঃ**, **নমঃ ... জম্ভে**, **দধ্মঃ**) পূর্ববত্।

আধ্যাত্মিক ভাষ্য

(উদীচী, দিক্, সোমঃ, অধিপতিঃ, স্বজঃ, রক্ষিতা, অশনিঃ, ইষবঃ) তারপর সেই সাধক নিজের মনকে উত্তর ভাগে নিয়ে যায়। সে পূর্বোক্ত তিন ভাগে ঈশ্বরকে বিভিন্ন রূপে অনুভব করে তাঁর সোমস্বরূপকে অনুভব করে। সোমের অর্থ হল – শান্তিদায়ক আর জগৎকে উৎপন্ন আর প্রেরিতকারী। পৃষ্ঠ-ভাগে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপী বরুণরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে সে শান্তির অনুভব করতে থাকে। এই কারণে এখানে সোমরূপ পরমাত্মার চর্চা আছে। উত্তর দিশা উৎকর্ষের দিশাও মানা যেতে পারে। যখন সাধক সৃষ্টির উৎপাদক আর প্রেরক পরমাত্মাকে নিজের সাধনা আর জীবনের উৎকর্ষের অধিপতিরূপে মেনে নেয়, তখন সে তার চিত্তে এক বিশেষ শান্তির অনুভব করতে থাকে। এখানে 'অশনিঃ' পদের অর্থ হল– **'য়েনাশ্নাতি য়োऽশ্নুতে ব্যাপ্নোতি বা স অশনিঃ'** (উণাদি কোষ২.১০৪) অর্থাৎ যে পরমাত্মা প্রলয়কালে সবাইকে গিলে নেন তথা সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান থাকেন, এই কারণে তাঁকে অশনি বলে। এখানে 'অশনিঃ' পদের বিশেষণ 'স্বজঃ' দেওয়া হয়েছে, যার দুটো অর্থ হতে পারে, একটা হল– 'সু+অজঃ' অর্থাৎ উত্তম রূপে গমনকারী আর আমাদের দুঃখ আর দুর্গুণের নাশকারী।

এখানে প্রশ্ন ওঠে যে ঈশ্বর কি গতি করেন? না, তিনি হলেন সর্বব্যাপক, তাই তাঁর গতি করার আবশ্যকতা হয় না, কারণ তিনি আগে থেকেই সর্বত্র বিদ্যমান আছেন, এইজন্য তাঁকে 'মনসো জবীয়ঃ' বলা হয়েছে। 'স্বজঃ'এর দ্বিতীয় অর্থ হল – 'স্ব+জঃ' অর্থাৎ স্বয়ম্ভু। এর অর্থ হল তিনি জ্ঞান, বল, ক্রিয়া আদির দৃষ্টিতে কারও অপেক্ষা করেন না, বরং এইসব তাঁর ভিতরে স্বয়ংই

উৎপন্ন হয়। এইজন্য উপনিষদত্কার বলেছেন—**স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।** (শ্বেতা.) এইরূপ স্বয়ম্ভু, অনন্ত স্বাভাবিক শক্তি সম্পন্ন, সর্বব্যাপক এবং দুঃখ আর দুর্গুণের নাশক পরমাত্মা সাধককে নিজের উত্তর অর্থাৎ উৎকর্ষের দিশাতে রক্ষক প্রতিত হয় আর এই কারণে সে এই দিশাতে নিজের সম্পূর্ণ দুরিত দূরে চলে যাওয়ার অনুভব করে। সে এই দিশাতে ধ্যান করে তার চিত্তের মধ্যে থাকা দোষকে খুঁজে-খুঁজে বাইরে বের করে আর সেগুলো দূরে চলে যাওয়ার অনুভবের সঙ্গে চিত্তশুদ্ধির অনুভব করে।

(**তেভ্যঃ**, **নমঃ ... জন্তে**, **দধ্মঃ**) পূর্ববত্।

আধিভৌতিক ভাষ্য

(**উদীচী**, **দিক্**, **সোমঃ**, **অধিপতিঃ**, **স্বজঃ**, **রক্ষিতা**, **অশনিঃ**, **ইষবঃ**) [**উদীচী** = এষা (উদীচী) বৈ দেবমনুষ্যাণাম্ শান্তা দিক্ (তৈত্তেরীয় ব্রাহ্মণ ২.১.৩.৫)] রাষ্ট্রের যেসব নাগরিক শান্তিপ্রিয় যশস্বী হবে, তাদের সঙ্গে রাজা সোমরূপ ব্যবহার করবেন অর্থাৎ শান্তিপ্রিয় বচন দ্বারা তাদের রাষ্ট্রের বিকাশে যোগদানের জন্য উদ্যত করবেন। এমনটা না হলে রাজা তাদের অধিপতি রূপ হয়ে ন্যায়পূর্ণ কর আদির দ্বারা তাদের সহযোগীতা নিবেন। এই কাজে রাজার সাথে-সাথে রাষ্ট্রের প্রগতিতে নিরন্তর গতিশীল অর্থাৎ উদ্যোগী 'অশনি' অর্থাৎ বিদ্যুৎ আদি বিদ্যার জ্ঞাতাগণ সেই নাগরিকদের প্রেরিত করবেন। তারা না কেবল রাষ্ট্রের বিকাশের জন্য, অপিতু নিজেদের বিদ্যা আদির বিকাশের জন্যও তাদের প্রেরিত করবেন।

(**তেভ্যঃ**, **নমঃ ... জন্তে**, **দধ্মঃ**) পূর্ববত্।

ওম্ ধ্রুবা দিগ্বিষ্ণুরধিপতিঃ কল্মাষগ্রীবো রক্ষিতা বীরুধ ইষবঃ। তেভ্যো নমোऽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। য়ো৩স্মান্দ্বেষ্টি য়ম্ বয়ম্ দ্বিষ্মস্তম্ বো জম্ভে দধ্মঃ ॥

[অথর্ববেদ ৩.২৭.৫]

এর ঋষি হল অথর্বা আর ছন্দ অষ্টি তথা দেবতা হল বিষ্ণু এবং বীরুধ। [**বিষ্ণুঃ** = য়দ্ বিষিতো ভবতি তদ্ বিষ্ণুর্ভবতি, বিষ্ণুর্বিশতের্বা, ব্যশ্নোতের্বা (নিরুক্ত ১২.১৮), ব্যাপ্তশীলম্ বিদ্যুদ্রূপাগ্নিঃ (তুলনা মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১২.৫), য়জ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৯.৩.৯)। **বীরুধ** = বীরুধ ওষধয়ো ভবতি। বিরোহণাত্ (নিরুক্ত ৬.৩), **ওষধিঃ** = অগ্নের্বা এষা তনূঃ য়দোষধয়ঃ (তৈত্তেরীয় ব্রাহ্মণ ৩.২.৫.৭), ওষধয়ো বর্হিঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫.২৮), ওষধয়ঃ খলু বৈ বাজঃ (তৈত্তেরীয় ব্রাহ্মণ ১.৩.৭.১)] এর দৈবত এবং ছান্দস প্রভাব দ্বারা বিদ্যুৎ আর বজ্র রশ্মির প্রভাব অতি ব্যাপক হতে থাকে।

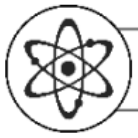

আধিদৈবিক ভাষ্য

(**ধ্রুবা**, **দিক্**, **বিষ্ণুঃ**, **অধিপতিঃ**, **কল্মাষগ্রীবঃ**, **রক্ষিতা**, **বীরুধঃ**, **ইষবঃ**) [অহর্বৈ ধ্রুবম্ (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ৩.৫৮)] সেই বিশাল মেঘের কেন্দ্রীয় ভাগে বিষ্ণু অধিপতি রূপ হয়। এর অর্থ হল বিদ্যুৎ রূপ অগ্নি বিশাল মেঘের ভিতরে প্রবেশ করে বিবিধ প্রকারে ব্যাপ্ত হতে থাকে। এর কারণেই সেই ক্ষেত্রে বিদ্যমান কণা বা রশ্মিগুলো পরস্পর সংযোগ করতে পারে। যেকোনো নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় ভাগে হতে চলা একীকরণ আদি ক্রিয়াকে বিদ্যুৎই নিয়ন্ত্রণ করে, এই কারণে বিদ্যুৎ রূপী বিষ্ণুকে ধ্রুব দিশার অধিপতি বলা হয়েছে।

এখানে বীরুধ রশ্মিগুলো ইষু অর্থাৎ বজ্র রশ্মির কাজ করে। সেই মরুত্ রশ্মিগুলো, যারা উত্তেজিত আর সংকুচিত হয়ে উষ্মাকে উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়, তাদের বীরুধ বলা হয়। বিশেষ এবং বিবিধ রূপে উৎপন্ন বা প্রদর্শিত এই ওষধি সঞ্জক প্রাণ আর মরুত্ আদি রশ্মি নানা প্রকারের দেব কণাকে অসুরাদি বাধক পদার্থ থেকে উত্তীর্ণ করে আর তাদের য়জন কর্মেও উত্তীর্ণ করে।

[**কল্মাষঃ** = শ্বেতকৃষ্ণবর্ণঃ (পশুঃ) (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ২৯.৫৮), **গ্রীবা** = গ্রীবা গিরতের্বা (নিরুক্ত ২.২৮)] একইসঙ্গে সেইসব পশু সঞ্জক মরুত্ এবং প্রাণ রশ্মি অসুর আদি বাধক রশ্মিকে অবশোষিত করে নষ্ট করে দেয়, এই কারণে এদের রক্ষিতা বলা হয়েছে।

(**তেভ্যঃ**, **নমঃ ... জন্তে**, **দধ্মঃ**) পূর্ববত্।

আধ্যাত্মিক ভাষ্য

(**ধ্রুবা**, **দিক্**, **বিষ্ণুঃ**, **অধিপতিঃ**, **কল্মাষগ্রীবঃ**, **রক্ষিতা**, **বীরুধঃ**, **ইষবঃ**) তারপর সেই সাধক নিজের মনকে ধ্রুবা দিশা অর্থাৎ নিজের আধারের দিকে নিয়ে যায়। [**ধ্রুবম্** = নিশ্চলম্ সুখম্ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১.১৭), নিশ্চলো নিশ্চলকর্ত্তা (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ৫.৩০), অখণ্ডিতানি (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৩. ৫৬.১)] এখানে সে সকলের আধার, নিশ্চল ও অখণ্ড-স্বরূপ পরমাত্মাকে বিষ্ণুরূপে নিজের অধিপতি অনুভব করে।

বিষ্ণুর অর্থ হল – 'বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি চরাচর জগত্ স পরমেশ্বরঃ' (উণাদি কোষ৬.৩) 'সর্বাऽন্তঃপ্রবিষ্ট' (জগদীশ্বর) (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ৫.১৯) অর্থাৎ সম্পূর্ণ চরাচর জগতের মধ্যে ব্যাপ্তকারী। পরমাত্মাকে প্রত্যেক কণাতে

বিদ্যমান অনুভব করে সে নিশ্চল সুখের অনুভূতি করতে থাকে।

এখানে 'বীরুধঃ' পদের বিষয়ে বলা হয়েছে – 'বীরুধ ওষধয়ো ভবন্তি' (নিরুক্ত ৬.৩),'ওষধিব্যাপিন্ (ঈশ্বরঃ)' (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.৮৭.১০), 'দোষম্ ধয়ন্তীতি বা' (নিরুক্ত ৯.২৭) [**কল্মাষঃ** = কল্মষঃ (এটা হল ছান্দস প্রয়োগ), **কল্মাষগ্রীবঃ** = দোষের নাশক] অর্থাৎ সর্বব্যাপক পরমাত্মার প্রেরণা আর সাহচর্যে সেই সাধক নিজের দোষগুলো থেকে স্বয়ংকে দূর হওয়ার অনুভব করতে থাকে। এইভাবে সে দোষের নাশক পরমপিতা পরমাত্মাকে নিজের রক্ষক অনুভব করে।

(**তেভ্যঃ**, **নমঃ ... জম্ভে**, **দধ্মঃ**) পূর্ববত্।

আধিভৌতিক ভাষ্য

(**ধ্রুবা**, **দিক্**, **বিষ্ণুঃ**, **অধিপতিঃ**, **কল্মাষগ্রীবঃ**, **রক্ষিতা**, **বীরুধঃ**, **ইষবঃ**) রাজা রাষ্ট্রের ধ্রুব [**ধ্রুবম্** = ধর্মগ্রহণেऽধর্মত্যাগে চ দৃঢোত্সাহঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ২৭.৩৯)] অর্থাৎ ধর্মকে গ্রহণ করতে আর অধর্মকে ত্যাগ করতে দৃঢ় উৎসাহী বিদ্বানদের সম্মান আর সহযোগিতা করবে আর তাদের সঙ্গে ন্যায়-পূর্ণ ব্যবহার করবে। সে বিষ্ণুরূপ হয়ে সর্বদা বিদ্বানদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা করবে।

এইরূপ বিদ্বানদের লোকোপকারক কর্মে যে দুষ্ট ও পাপী জন বাধা উৎপন্ন করবে, রাষ্ট্রের মধ্যে স্থানে-স্থানে ব্যাপ্ত রাজার সৈনিক তাদের শস্ত্রের সহায়তায় বন্দী বানিয়ে কারাগারে পাঠিয়ে দিবে আর এইভাবে বিদ্বান জনদের রক্ষা করবে।

(**তেভ্যঃ**, **নমঃ ... জম্ভে**, **দধ্মঃ**) পূর্ববত্।

ওম্ ঊর্ধ্বা দিগ্বৃহস্পতিঃ শ্বিত্রো রক্ষিতা বর্ষমিষবঃ। তেভ্যো নমোऽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। য়োঽস্মান্দ্বেষ্টি য়ম্ বয়ম্ দ্বিষ্মস্তম্ বো জম্ভে দধ্মঃ ॥

[অথর্ববেদ ৩.২৭.৬]

এর ঋষি হল অথর্বা আর ছন্দ অষ্টি তথা দেবতা হল বৃহস্পতি এবং বর্ষা। [**বৃহস্পতিঃ** = বৃহতাম্ পালকঃ সূত্রাত্মা (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ৩৯.৬), বাগ্বৈ বৃহতী তস্যা এষ পতিস্তস্মাদু বৃহস্পতি (মাশ.১৪.৪.১.২২), **বর্ষা** = বর্ষা বৈ সর্বऽঋতবঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.২.৩.৭), বার্হস্পত্যমুপসন্নমগ্নেঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫.২৬), **উপসদঃ** = ইমে লোকা উপসদঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১০.২.৫.৮), তপো হ্যুপসদঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.৬.২.১১), বজ্রা বা ऽউপসদঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১০.২.৫.২), ঋতব উপসদঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১০.২.৫.৭)] এর দৈবত ও ছান্দস প্রভাবে সূত্রাত্মা বায়ু ও ঋতু রশ্মি সম্পূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হয়ে সংঘনন প্রক্রিয়াকে তীব্র করে।

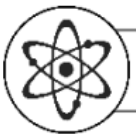

আধিদৈবিক ভাষ্য

(**ঊর্ধ্বা**, **দিক্**, **বৃহস্পতিঃ**, **অধিপতিঃ**, **শ্বিত্রঃ**, **রক্ষিতা**, **বর্ষম্**, **ইষবঃ**) সেই বিশাল মেঘের ঊর্ধ্ব অর্থাৎ বাইরের ভাগে বৃহস্পতি অধিপতি রূপে থাকে। এর অর্থ হল সূত্রাত্মা বায়ু বিভিন্ন রশ্মির দ্বারা বিশাল মেঘগুলোকে ধারণ করে। বৃহতী রশ্মি, যা তারার পরিধি নির্মাণ করে, তার পালকও এই সূত্রাত্মা বায়ুই হয়, এইজন্যই একে ঊর্ধ্ব দিশার অধিপতি বলা হয়েছে।

এখানে বর্ষা রশ্মিগুলো ইষু অর্থাৎ বজ্র রশ্মির কাজ করে। 'বর্ষম্' পদের 'বৃষু সেচনে হিম্সাসম্ক্লেশনয়োশ্চ' ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়ার কারণে এই

সংকেত পাওয়া যায় যে এই রশ্মিগুলো নক্ষত্র নির্মাণ প্রক্রিয়াতে বাধক হওয়া অসুর রশ্মিকে নষ্ট করার কাজ করে। একইসঙ্গে বজ্ররূপী রশ্মিগুলো বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে নির্মাণাধীন লোকের তাপকে বাড়িয়ে দেয় তথা ঋতু রশ্মিগুলো সমৃদ্ধ হয়ে পদার্থের সঙ্কোচন আর সংঘননকে সমৃদ্ধ করে। সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মিও বিশেষ সমৃদ্ধ ও সক্রিয় হয়ে সম্পূর্ণ পদার্থের মধ্যে সঙ্গমন, সঙ্কোচন বা সংঘনন কর্মকে তীব্র করে। একইসঙ্গে বিদ্যুদগ্নি আর সব প্রাণ রশ্মিগুলোও অতি সক্রিয় হয়ে ছড়িয়ে থাকা পদার্থকে নির্মাণাধীন দ্যুলোকের কেন্দ্রীয় ভাগের দিকে তীব্রতার সঙ্গে আকৃষ্ট করে।

এখানে 'শিবত্রঃ' [স্বিদা স্নেহনমোচনয়োঃ, স্বিদা অব্যক্তে শব্দে এবং শ্বিতা বর্ণে] পদের অভিপ্রায় হল অব্যক্ত শব্দ করার সঙ্গে-সঙ্গে নক্ষত্রের উপর এই ঋতু রশ্মির নিরন্তর বৃষ্টি হতে থাকে। একইসঙ্গে এই রশ্মি নক্ষত্রের থেকে অনিষ্ট পদার্থকে বাইরে বের করে নিজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এই কারণেই এগুলোকে এই ক্ষেত্রের রক্ষক বলা হয়েছে। এখানে 'স্বিদা' ধাতুর 'স্'–কে 'শ্' হওয়া ছান্দস প্রয়োগ মানা উচিত।

(**তেভ্যঃ**, **নমঃ ... জন্তে**, **দধ্মঃ**) পূর্ববত্।

আধ্যাত্মিক ভাষ্য

(**ঊর্ধবা**, **দিক্**, **বৃহস্পতিঃ**, **অধিপতিঃ**, **শ্বিত্রঃ**, **রক্ষিতা**, **বর্ষম্**, **ইষবঃ**) এখন সেই সাধক নিজের মনকে ঊর্ধবা দিশা অর্থাৎ নিজের উপরের দিকে নিয়ে যায়। এখানে সে সর্বোৎকৃষ্ট গুণ যুক্ত পরমাত্মাকে বৃহস্পতি রূপে নিজের অধিপতি অনুভব করে।

বৃহস্পতির অর্থ হল – 'বৃহতো বচনস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য বা পালকঃ' (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৪.২৫), 'বৃহতঃ পাপাদ্বিয়োজকঃ' (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ২.২৩.৭) অর্থাৎ সম্পূর্ণ জ্ঞানবিজ্ঞান আর ব্রহ্মাণ্ডের পালক পরমাত্মাকে সে নিজের উপরের দিশাতে অনুভব করে। একইসঙ্গে সেই সাধক সৃষ্টির পালক পরমাত্মার সাহচর্যে পাপকে স্বয়ং থেকে মুক্ত হওয়া অনুভব করে।

এখানে 'বর্ষম্' পদের বিষয়ে মহর্ষি দয়ানন্দ বলেছেন– 'য়জ্ঞকর্মণা সর্বসুখ-সেচক' (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ৬.১১) অর্থাৎ সৃষ্টির সঞ্চালক আর আনন্দবর্ষক পরমাত্মার প্রেরণায় সেই মুমুক্ষু জন্ম-মরণের বন্ধন থেকে স্বয়ংকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার অনুভব করতে থাকে। এইভাবে সে সর্ববিধ সুখের দাতা পরমপিতা পরমাত্মাকে নিজের রক্ষক অনুভব করে।

(**তেভ্যঃ**, **নমঃ ... জন্তে**, **দধ্মঃ**) পূর্ববত্।

[সাধক যখন সাধনার জন্য বসে, তখন পূর্বোক্ত মন্ত্রের দ্বারা পরমাত্মার গুণ-কর্ম-স্বভাবের স্তুতি করার পশ্চাৎ সেই মহান্ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা প্রারম্ভ করে। প্রার্থনা করতে গিয়ে সেই সাধক নিজের বিচরণ করতে থাকা মনকে বারংবার নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এই ক্রমেই সে ভিন্ন-ভিন্ন দিশাতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুভব করে নম্রীভূত হয়ে একই প্রার্থনাকে বারংবার করতে থাকে।]

আধিভৌতিক ভাষ্য

(**ঊর্ধবা**, **দিক্**, **বৃহস্পতিঃ**, **অধিপতিঃ**, **শ্বিত্রঃ**, **রক্ষিতা**, **বর্ষম্**, **ইষবঃ**)
রাজা বৃহস্পতিরূপ হয়ে রাষ্ট্রের ঊর্ধব [**ঊর্ধব** = উন্নতঃ রাজকর্মচারিজনঃ] অর্থাৎ উচ্চ অধিকারী জনের পালন এবং রক্ষণ করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেইসব অধিকারীরা নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যার প্রতি নিশ্চিন্ত হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত

তারা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে নিজেদের কর্তব্য নির্বহন করতে পারবে না। এইজন্য রাজার উচিত যে তিনি তার অধীনস্থ উচ্ছাধিকারীদের সুরক্ষা ও সুবিধা পূর্ণরূপে ধ্যান রাখবে।

সেই অধিকারীদেরও উচিত যে তারা সবাই এষণাদি দোষকে সর্বদা ত্যাগ করবে, কারণ এরফলে রাষ্ট্রের অনেকবিধ হানি হওয়ার আশঙ্কা থাকে আর এমন অধিকারীকেই বিদেশি আক্রান্তার দ্বারা সহজে রাষ্ট্রদ্রোহী বানানো যেতে পারে। এইভাবে সেই অধিকারীরা এইসব দোষ ত্যাগ করে শ্বিত্ররূপ হয়ে স্বয়ং রাষ্ট্রের মধ্যে সুখের বর্ষণকারী হয়ে অন্য অধিকারীদের প্রেরক হয়ে রাষ্ট্র রক্ষাতে নিজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(**তেভ্যঃ**, **নমঃ ... জম্ভে**, **দধ্মঃ**) পূর্ববত্।

এইসব মন্ত্র সাধককে জীবনে সজাগ থাকার প্রেরণা দেয়। সমাজে কাটার উপদ্রবকে দেখে সাধক নিজের সাধনায় লীন হয়ে দুষ্ট জনদের দিক থেকে চক্ষু বন্ধ করে নিবে, এমনটা ভাবা অবৈদিক তথা অবিবেকপূর্ণ বিচার। সাধক সর্বদা সতর্কতার সঙ্গে দুষ্ট আর দুষ্প্রবৃত্তির বিরূদ্ধে সম্পূর্ণ বুদ্ধি আর শক্তির সঙ্গে দৃঢ় থাকবে আর সমাজকেও জাগ্রত করতে থাকবে, এটাই আমাদের ঋষি-মুনি, দেব তথা বৈদিক মহাপুরুষদের আদেশ ছিল আর তাঁরাও এইরকম জীবনযাপন করতেন। মনে রাখতে হবে যে শস্ত্র দ্বারা রক্ষিত রাষ্ট্রের মধ্যেই শাস্ত্র আর ব্রহ্মের সাধনা হওয়া সম্ভব।

উপস্থান-মন্ত্রাঃ

ওম্ উদ্বয়ম্ তমসস্পরি স্বঃ পশ্যন্ত ऽ উত্তরম্ ।
দেবম্ দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ।। [য়জুর্বেদ ৩৫.১৪]

এই মন্ত্রের ঋষি হল দেবাঃ। এর তাৎপর্য হল এই ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি বিভিন্ন প্রাথমিক প্রাণ রশ্মির দ্বারা হয় অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণ রশ্মির বিদ্যমানতার মধ্যেই এই ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি হয়। এর দেবতা হল সূর্য ও ছন্দ হল বিরাডনুষ্টুপ্। এই কারণে এর দৈবত্ এবং ছান্দস প্রভাবে সূর্যলোক বিবিধ প্রকারের বহুরঙ্গী প্রকাশযুক্ত হতে থাকে।

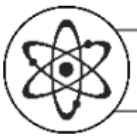

আধিদৈবিক ভাষ্য

(বয়ম্, তপসঃ, পরি, স্বঃ, পশ্যন্তঃ, উত্তরম্, দেবম্) বয়ম্ অর্থাৎ এই ছন্দ রশ্মির কারণভূত প্রাণ রশ্মিগুলো অন্ধকারযুক্ত পদার্থকে উৎকৃষ্টতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে থাকা প্রকাশমান ভাগকে অথবা প্রকাশযুক্ত পদার্থকে সবদিক থেকে আকৃষ্ট করে স্বর্গলোক অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ভাগের দিকে নিয়ে যায়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে আমি 'দৃশ্' ধাতুর অর্থ 'আকৃষ্ট করা' কিভাবে নিয়েছি? এর উত্তরে আমি এটাই বলবো যে ঋষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ১.২৪.১ ভাষ্যে 'দৃশেয়ম্' পদের অর্থ 'ইচ্ছাম্ কুর্য়াম' করেছেন আর জড় জগতের মধ্যে ইচ্ছা করা আকর্ষণ করার সমানই হয়। এখানে স্পষ্ট হল যে সূর্যলোকের ভিতরে যে-যে ক্ষেত্র তেজস্বী হয়, সেই-সেই ক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন প্রাণ রশ্মি বিভিন্ন কণাকে আকর্ষিত করে কেন্দ্রীয় ভাগের দিকে নিয়ে যায়। এর অর্থ হল যেমন-যেমন ভাবে সূর্যলোক গরম হতে থাকে, তেমনি-তেমনি ভাবে এই প্রক্রিয়ার তীব্রতা বাড়তে থাকে।

(দেবত্রা, সূর্য়ম্, উত্, অগন্ম, জ্যোতিঃ, উত্তমম্) সেই উপরোক্ত স্বর্গলোক অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ভাগ কিরকম হয়? এর জন্য বলা হয়েছে সেই ভাগ সূর্য স্বরূপ হয় অর্থাৎ সেই ভাগ নানা প্রকারের কণা আর তরঙ্গকে উৎপন্নকারী, সম্পূর্ণ

লোককে নিজের আকর্ষণ দ্বারা প্রেরিতকারী আর ধীরে-ধীরে নিজের কক্ষের উপর ঘূর্ণনকারী হয়। একইসঙ্গে সেটা উত্তম জ্যোতিরূপ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট তথা সম্পূর্ণ সূর্যলোকের জ্যোতির কারণরূপ হয়। এই ভাগকে 'দেবত্রা' এইজন্য বলা হয়েছে, কারণ এই ভাগের মধ্যে সব প্রকারের দেব অর্থাৎ প্রাণ রশ্মি তথা নানা প্রকারের প্রকাশিত কণা ভর্তি থাকে। এইরকম সেই উত্তম কেন্দ্রীয় ভাগকে বহিরাগত বিশাল ভাগ থেকে আসা কণা তীব্র বেগের সঙ্গে প্রাপ্ত করে।

[মনসা পরিক্রমা মন্ত্রের দ্বারা সাধক নিজের মনকে সব দিশাতে নিয়ে গিয়ে সর্বত্র ঈশ্বরেরই অনুভব করে আর অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে নম্রীভূত হয়ে নিজের সব দোষ দূর হয়ে যাওয়ার ভাবনা করে পবিত্রতার অনুভব করতে থাকে। এরপর সে উপস্থান মন্ত্রের দ্বারা ঈশ্বরের আরও অধিক সামীপ্য অনুভব করতে থাকে।

আধ্যাত্মিক ভাষ্য

(**বয়ম্**, **তপসঃ**, **পরি**, **স্বঃ**, **পশ্যন্তঃ**, **উত্তরম্**) আমরা সাধকগণ অজ্ঞানান্ধ-কার থেকে সর্বদা পূর্ণ জ্ঞান এবং আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে নিজের চারিদিকে অনুভব করে (**দেবম্**, **দেবত্রা**, **সূর্যম্**, **উত্**, **অগন্ম**, **জ্যোতিঃ**, **উত্তমম্**) সকল প্রকাশিত পদার্থের মধ্যে সর্বাধিক তেজস্বী, সকল দাতার মধ্যে সবথেকে বড় দাতা এবং সকল জ্ঞানীর মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী, সর্বোত্তম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্যরূপ অর্থাৎ সকলের জ্ঞানের প্রকাশক, সকলের অন্তঃকরণে সৎকর্মের প্রেরণাকারী, সকলের উৎপাদক পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে উৎকৃষ্টতার সঙ্গে জানি আর প্রাপ্ত করি।

এই মন্ত্রের উপর চিন্তন করার সময় সাধক মন্ত্রানুসারে এমন জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মাকে নিজের চারিদিকে অনুভব করতে থাকে।

আধিভৌতিক ভাষ্য

(**বয়ম্**, **তপসঃ**, **পরি**, **স্বঃ**, **পশ্যন্তঃ**, **উত্তরম্**) আমরা নিজেদের উত্থানের জন্য অথবা রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য অজ্ঞান আর দুরিতের অন্ধকার থেকে উত্তীর্ণ করতে সক্ষম, এমন নির্মল চরিত্র আর বিজ্ঞানযুক্ত বিদ্বান বা রাজাকে সবদিকে সন্ধান করে (**দেবম্**, **দেবত্রা**, **সূর্য়ম্**, **উত্**, **অগন্ম**, **জ্যোতিঃ**, **উত্তমম্**) বিভিন্ন দেবপুরুষ অর্থাৎ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন বিদ্বানদের মধ্যে সূর্যের সমান সর্বোত্তম দেব-পুরুষকে উত্তম প্রকারে প্রাপ্ত করি।

ভাবার্থ –

মানুষের উচিত যে নিজের জীবনের উত্থানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মার্গদর্শক গুরুকে সন্ধানের জন্য অনেক বিদ্বানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠকেই চয়ন করবে। একই ভাবে রাষ্ট্রের নাগরিকদের উচিত যে নিজেদের রাজা চয়ন করার সময় সর্বোত্তম বিদ্বান আর সত্ত্বগুণসম্পন্ন পুরুষকেই চয়ন করবে। এইরকম গুরু আর রাজাই অজ্ঞান আর দুরিত থেকে উত্তীর্ণ করতে পারবেন।

সাধকের উচিত যে সে সর্বদা গুণী ব্যক্তিদের সম্মান করবে আর অবগুণী ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকবে।

ওম্ উদু ত্যম্ জাতবেদসম্ দেবম্ বহন্তি কেতবঃ ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য়্যম্ ॥ [য়জুর্বেদ ৩৩.৩১]

এই মন্ত্রের ঋষি হল প্রস্কণ্ব। এর অর্থ হল এই ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির বিশেষ স্বরূপ থেকে হয়। এর দেবতা সূর্য আর ছন্দ নিচৃদ্ গায়ত্রী হওয়ার কারণে এর দৈবত আর ছান্দস প্রভাবে সূর্যলোক তীক্ষ্ণ শ্বেতবর্ণীয় তেজ

যুক্ত হতে থাকে।

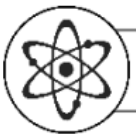

আধিদৈবিক ভাষ্য

(**উত্**, **উ**, **ত্যম্**, **জাতবেদসম্**, **দেবম্**, **বহন্তি**, **কেতবঃ**, **দৃশে**, **বিশ্বায়**, **সূর্য়ম্**) [**কেতুঃ** = (নিঘন্টু ৩.৯) কেতুনা কর্মণা প্রজ্ঞয়া বা (নিরুক্ত ১১.২৭), কেতবঃ রশ্ময়ঃ (নিরুক্ত ১২.১৫)। **জাতবেদঃ** = তদ্ য়জ্জাতম্ জাতম্ বিন্দতে তস্মাজ্জাতবেদাঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৯.৫.১.৬৮)] সমস্ত লোক আদি পদার্থের মধ্যে নিজের মহাকর্ষীয় বল এবং প্রকাশ, উষ্মা আদির রূপে বিদ্যমান সকলের প্রকাশক সেই সূর্যলোককে সবাইকে দর্শানোর জন্য তার প্রকাশের কিরণ উপরের দিকে অর্থাৎ সূর্যলোকের বাইরে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত মহাকাশে নিশ্চিত রূপে ব্যাপ্ত হতে থাকে।

ভাবার্থ –

যখনই সূর্যলোক উৎপন্ন হয়, তখন থেকেই সেটা নিজের মণ্ডলের গ্রহ আদি লোকগুলোকে নিজের আকর্ষণ বল দ্বারা বাঁধতে আর নিজের চারিদিকে পরিক্রমণ করাতে লেগে যায়। একইসঙ্গে সেটা তখন থেকেই সেইসব লোককে উষ্মা আর প্রকাশও দিতে থাকে। সেই সূর্যলোক থেকে যেসব মহাকর্ষীয় তরঙ্গ অন্তরীক্ষে যায়, সেগুলো সেখানে বিদ্যমান সব লোক আদি পদার্থকে প্রভাবিত করে। এইভাবে সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ সব পদার্থকে প্রকাশ তথা উষ্ণতা প্রদান করে। এইসব মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অভাবে কোনো লোক আদি পদার্থই সূর্যের অস্তিত্বকে অনুভব করবে না আর না তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পরিক্রমণ করবে। অন্যদিকে সূর্য থেকে আসা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের অভাবে না তো সূর্যলোক দেখা দিবে আর না উষ্ণতার অনুভব হবে।

আধ্যাত্মিক ভাষ্য

(উত্, উ, ত্যম্, জাতবেদসম্, দেবম্, বহন্তি, কেতবঃ, দৃশে, বিশ্বায়, সূর্য়ম্) সেই সকলের উৎপাদক, প্রেরক ও সকলকে গতি প্রদানকারী, সূর্যরূপী, প্রত্যেক সত্তাবান্ পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান এবং সকল মানুষকে সৃষ্টির আদিতে জ্ঞান দাতা দেব অর্থাৎ সৃষ্টিকে সহজে উৎপন্নকারী, সব সুখের দাতা পরমাত্ম দেবকে সকলকে দর্শানোর জন্য অর্থাৎ সেই ব্রহ্মের অনুভব করানোর জন্য সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থে তাঁরই ক্রিয়া আর বিজ্ঞান উৎকৃষ্ট রূপে প্রাপ্ত হয়। এর অর্থ হল সৃষ্টির সব পদার্থ ঈশ্বরের জ্ঞান আর কর্মকে দর্শিয়ে তাঁর অস্তিত্বের সাক্ষাৎ বোধ করিয়ে দেয়। এইসব কর্মকে দেখে মানুষও অনেক প্রকারের কর্ম করার প্রেরণা নেয়। এইজন্য বলা হয়েছে –

‘বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত য়তো ব্রতানি পস্পশে’

অর্থাৎ সেই সর্বব্যাপক পরমাত্মার বিজ্ঞানপূর্বক করতে থাকা কর্মকে দেখো আর তারদ্বারা নিজের ব্রত অর্থাৎ কর্ম করার প্রেরণা প্রাপ্ত করো। এই মন্ত্রের অর্থের উপর চিন্তন করার সময় সাধক তার চারিদিকে বিদ্যমান পৃথিব্যাদি গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি আর তাতে বিদ্যমান প্রাণীর শরীর ও বনস্পতি আদি স্থূল পদার্থ, নিজের শরীরে বিদ্যমান অন্নময়াদি পঞ্চকোষ, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম জগতে বিদ্যমান সূক্ষ্ম ভূত, প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মি, মহত্তত্ত্ব আদি সূক্ষ্ম পদার্থের উপর গম্ভীর ভাবে চিন্তন করে আর সেগুলোর ভিতরে সেই পরম তত্ত্ব পরমাত্মার বিজ্ঞান ও ক্রিয়া-কৌশলের অনুভূতি করে এইসবকে সেই পরমাত্মার বোধকারক পতাকার রূপে অনুভব করে পরমানন্দে নিমগ্ন হয়ে যায়। সৃষ্টির প্রত্যেক দৃশ্য বা অদৃশ্য বস্তুর মধ্যে তার পরমাত্মার অস্তিত্বেরই বোধ হয়।

আধিভৌতিক ভাষ্য

(উত্, উ, ত্যম্, জাতবেদসম্, দেবম্, বহন্তি, কেতবঃ, দৃশে, বিশ্বায়, সূর্য়ম্) [জাতবেদঃ = জাতপ্রজ্ঞানবল (তেজস্বিন্ রাজন্) (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৬.১৬.২৯), জাতেষু জনেষু জ্ঞানিন্ বিদ্বান্ (জন) (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৯.৩৯)] যখন কোনো রাষ্ট্রের রাজা এবং সমাজের আচার্য নিজের অন্তরে জ্ঞান, বিজ্ঞান আর বল উৎপন্ন করে সূর্যের সমান তেজস্বী এবং দিব্য গুণযুক্ত মার্গদর্শকের ভূমিকা নির্বহণ করে, তখন সকল বুদ্ধিমতী প্রজাকে সেই রাজা বা বিদ্বানের হিতকারী স্বরূপকে দর্শানোর জন্য তার হিতকারী বিধান আর উপদেশ সম্পূর্ণ রাষ্ট্র আর সমাজে সর্বত্র প্রাপ্ত হয়।

ভাবার্থ –

যখন কোনো রাষ্ট্রের রাজা বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বল সম্পন্ন হয়ে নিজের প্রজাদের ন্যায়পূর্বক পালন করে, তখন তার পালন আদি কর্ম আর তার দ্বারা নির্মিত বিধানের চিহ্ন সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়। সম্পূর্ণ প্রজা সুখী, সমৃদ্ধ, সুস্থ আর সংগঠিত থাকাই এমন প্রতীক হয়, যারদ্বারা রাজার দেবত্বের জ্ঞান হয়। এইভাবে কোনো আচার্যের জ্ঞান আর চরিত্রের চিহ্ন তার শিষ্যদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। ধ্যাতব্য হল, যদি কোনো রাষ্ট্রে প্রজাদের নানাবিধ দুঃখে পীড়িত দেখা যায়, তাহলে বুঝে নেওয়া উচিত যে সেই রাষ্ট্রের রাজা ধর্মাত্মা নয়, কারণ এমন ধর্মাত্মা রাজার রাজ্যে প্রজা কখনও দুঃখী হতে পারে না।

সাধকের সাধনা তখনই সফল মানা যেতে পারে, যখন তার ব্যবহার দ্বারা সজ্জন, দুর্বল আর দুঃখী ব্যক্তিরা প্রসন্ন থাকবে। যারা কথায়-কথায় পরিবার আর সমাজের মধ্যে ক্রোধ-কলহ করে, সবাইকে নিজের সাধনার অহংকার দর্শায়,

সেইসব সাধকই পথভ্রষ্টতার পরিচায়ক হয়।

ওম্ চিত্রম্ দেবানামুদগাদনীকম্ চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবীऽ অন্তরিক্ষম্ সূর্য্য ऽ আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ স্বাহা॥

[য়জুর্বেদ ৭.৪২]

এই মন্ত্রের ঋষি হল কুত্স। [**কুত্স** = বজ্রনাম (নিঘন্টু ২.২০), কুত্স এতত্ কৃন্ততেঋষিঃ কুত্সো ভবতি, কর্ত্তা স্তোমানামিত্যৌপমন্যবঃ অত্রাপ্যস্য বধকর্মৈব ভবতি (নিরুক্ত ৩.১১)] এর অর্থ হল এই ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি এমন বজ্র রশ্মি থেকে হয় যা নানা প্রকারের বাধক পদার্থকে নষ্ট করে আর নানা প্রকারের গায়ত্রী রশ্মিকে উৎপন্ন করে। স্তোমের বিষয়ে বলা হয়েছে – 'গায়ত্রীমাত্রৌ বৈ স্তোমঃ' (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১৯.৮)। এর দেবতা সূর্য ও ছন্দ ভুরিক্ আর্ষী ত্রিষ্টুপ্ হওয়াতে এর দৈবত আর ছান্দস প্রভাবে সূর্যলোক তীব্র রক্তবর্ণীয় তেজযুক্ত হতে থাকে।

আধিদৈবিক ভাষ্য

(**চিত্রম্, দেবানাম্, উত্, অগাত্, অনীকম্, চক্ষুঃ, মিত্রস্য, বরুণস্য, অগ্নেঃ**) সেই সূর্যলোক বিভিন্ন দেব পদার্থের সমূহরূপ হয়ে অন্য সব লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপে উৎকৃষ্টভাবে নিজের প্রকাশ দ্বারা সকলকে ব্যাপ্ত করে। এর অর্থ হল এই সৃষ্টির মধ্যে সূর্যাদি তেজস্বী লোকই এইসবের প্রকাশিত হওয়ার কারণ হয়। এইসব লোকের মধ্যে প্রায়শঃ সব প্রকারের দেব পদার্থ বিদ্যমান থাকে। এইসব লোক মিত্র অর্থাৎ প্রাণ, বরুণ অর্থাৎ অপান ও উদান, অগ্নি অর্থাৎ বিদ্যুৎ আদির চক্ষু রূপ হয়। এর অর্থ হল সূর্যলোকের দ্বারা তাতে বিদ্যমান প্রাণ,

অপান, ব্যান, উদান তথা বিদ্যুৎ আদির উপস্থিতির বোধ হয়। বস্তুতঃ এদের উৎপত্তি বিনা সূর্যলোকের অস্তিত্বই সম্ভব নয়, এইজন্য সূর্যলোককে এদের চক্ষু অর্থাৎ প্রকাশক বলা হয়েছে।

(**আ**, **অপ্রাঃ**, **দ্যাবাপৃথিবী**, **অন্তরিক্ষম্**, **সূর্য়ঃ**, **আত্মা**, **জগতঃ**, **তস্থুষঃ**, **চ**, **স্বাহা**) সেই সূর্যলোক নিজের কিরণের ব্যাপকতার দ্বারা দ্যুলোক, সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ আদি লোক এবং অন্তরীক্ষকে সবদিক থেকে ব্যাপ্ত করে। এইভাবে সেই সূর্য সমস্ত জড় আর জঙ্গম পদার্থের আত্মা হয়। এর অর্থ হল সেটা সমস্ত জড় পদার্থ, বনস্পতি এবং প্রাণীদের শরীরকে নিজের ঊর্জার দ্বারা নিরন্তর ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ নিজের ঊর্জার দ্বারা সেইসব পদার্থের মধ্যে নিজের উপস্থিতি দর্শায়।

আধ্যাত্মিক ভাষ্য

(**চিত্রম্**, **দেবানাম্**, **উত্**, **অগাত্**, **অনীকম্**, **চক্ষুঃ**, **মিত্রস্য**, **বরুণস্য**, **অগ্নেঃ**) সেই পূর্বোক্ত পরব্রহ্ম পরমাত্মা অসংখ্য দেব অর্থাৎ মহান্ তেজস্বী লোকের বিচিত্র বা আশ্চর্যজনক বিশাল সমূহকে উৎকৃষ্ট ভাবে ব্যাপ্ত করেন। এখানে দেবের অর্থ হল সেইসব সূক্ষ্ম পদার্থ যা দীপ্তি ও বল আদি গুণযুক্ত হয়। সেগুলোর মধ্যেও সেই পরমাত্মা সর্বদা ব্যাপ্ত থাকেন। [**মিত্রাবরুণৌ** = দ্যাবা-পৃথিবী বৈ মিত্রাবরুণয়োঃ প্রিয়ম্ ধাম (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৪.২.৪০)] সেই ঈশ্বর মিত্র আর বরুণ অর্থাৎ সমস্ত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত লোকের এবং অগ্নি অর্থাৎ বিদ্যুৎ আদির প্রকাশক হন অর্থাৎ তাঁকে ছাড়া এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোনো পদার্থই প্রকাশিত হতে পারবে না। সেই ঈশ্বর সমস্ত প্রকাশকের প্রকাশক তথা সমস্ত লোকের আশ্রয় হন।

(**আ, অপ্রাঃ, দ্যাবাপৃথিবী, অন্তরিক্ষম্**) সেই ঈশ্বর দ্যুলোক, পৃথিবী লোক এবং অন্তরীক্ষ লোক অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে সম্পূর্ণ রূপে পূরণ করছেন অর্থাৎ তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে সবার পালন তথা সঞ্চালন করছেন। এইসব লোকের মধ্যে হতে চলা সমস্ত ক্রিয়া ঈশ্বরের বলের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সমস্ত ক্রিয়ার মুখ্য হেতু তিনিই হন।

(**সূর্যঃ, আত্মা, জগতঃ, তস্থুষঃ, চ, স্বাহা**) সকলের প্রকাশক সেই সূর্যরূপ পরমাত্মা জগৎ অর্থাৎ চলায়মান পদার্থ আর তস্থুষঃ অর্থাৎ স্থাবর পদার্থ উভয়ের আত্মারূপ হয়ে সেগুলোর মধ্যে ব্যাপ্ত হন। তিনি জড় ও চেতন উভয় প্রকারের পদার্থের মধ্যে সর্বদা বিদ্যমান থাকেন। [**স্বাহা** = বাঙনাম (নিরুক্ত **১.১১**), অনিরুক্তো বৈ স্বাহাকারঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.২.১.৩)] সেই ঈশ্বর অব্যক্ত 'ওম্' রশ্মির দ্বারা অথবা সেগুলোর রূপেই সম্পূর্ণ সৃষ্টি-যজ্ঞের সঞ্চালন করেন।

এই মন্ত্রের উপর চিন্তন করে সাধক তার চারিদিকে বিদ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক লোক-লোকান্তর আর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণা আর তরঙ্গের মধ্যে হতে চলা বিভিন্ন ক্রিয়ার সূক্ষ্ম বিবেচনা করে সেইসবের পিছনে সেই পরব্রহ্মের অপার সামর্থ্যের অনুভব করতে থাকে। সে বিভিন্ন প্রাণীর শরীর তথা বনস্পতির ভিতরে হতে চলা সূক্ষ্ম ক্রিয়ার মধ্যেও সেই ব্রহ্মের অস্তিত্বের অনুভব করে। এইসবের মধ্যে সে ঈশ্বরের দ্বারা স্পন্দিত হওয়া সর্বাধিক সূক্ষ্ম 'ওম্' রশ্মি এবং সেই 'ওম্' রশ্মির দ্বারা স্পন্দিত হওয়া অসংখ্য ছন্দ ও প্রাণ রশ্মির মহান্ ব্যাপারকে অনুভব করে পরমাত্মার দ্বারা তরঙ্গিত বা স্পন্দিত সেই বিশাল রশ্মি জালের মাঝে স্বয়ংকে বসে থাকার অনুভব করে অপার আনন্দের অনুভব করে।এরদ্বারা সে এমন মনে করে যে সে তার ইষ্ট পরমপিতা পরমাত্মার পবিত্র কোলে বসে আছে।

আধিভৌতিক ভাষ্য

(চিত্রম্, দেবানাম্, উত্, অগাত্, অনীকম্, চক্ষুঃ, মিত্রস্য, বরুণস্য, অগ্নেঃ) [**মিত্রাবরণৌ** = প্রাণোদানবিবাধ্যাপকাধ্যেতারৌ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ৫. ৪১.১) সূর্যের সমান তেজস্বী মহান্ রাজা বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বিদ্বান্ মন্ত্রীদের বিচিত্র সমূহ রূপে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রকে ব্যাপ্ত করেন। এখানে 'বিচিত্র' এর অর্থ হল রাজা তার দক্ষতা আর দূরদর্শিতার দ্বারা এমন মন্ত্রীমণ্ডলের গঠন করবেন যেটা না কেবল সামান্য প্রজা, অপিতু বিদ্বানদেরও বুঝতে কঠিন হবে। সেই রাজা মিত্র অর্থাৎ অধ্যাপক, বরুণ অর্থাৎ বিদ্যার্থী এবং অগ্নি অর্থাৎ সৈন্য অধিকারী এবং ধর্মাচার্যেরও চক্ষু অর্থাৎ মার্গদর্শক হবেন।

(আ, অপ্রাঃ, দ্যাবাপৃথিবী, অন্তরিক্ষম্) এইরকম রাজা পৃথিবী এবং সূর্যাদি লোকের সঙ্গে-সঙ্গে অন্তরীক্ষকে নিজের বিজ্ঞান আর ক্রিয়া-কৌশল দ্বারা অর্থাৎ লোক-লোকান্তরের মধ্যে গমনকারী বিমান দ্বারা পূর্ণ করেন অর্থাৎ এইসব লোকের মধ্যে তার গমনাগমন সহজ করেন।

(সূর্যঃ, আত্মা, জগতঃ, তস্থুষঃ, চ, স্বাহা) (**স্বাহা** = সত্যয়া ক্রিয়য়া (ঋগ্বেদ দয়ানন্দ ভাষ্য)] সবার প্রেরক সেই রাজা রাষ্ট্রের সব প্রাণী আর বনস্পতির মধ্যে তার সত্য ক্রিয়ার দ্বারা আত্মারূপ হয়ে বিচরণ করবেন। এর অর্থ হল রাষ্ট্রের সব প্রাণী আর বনস্পতি রাজ্যের সুনীতির প্রকাশের মধ্যেই ফলীভূত বা আনন্দিত হতে পারে। লোকপ্রসিদ্ধ রাম-রাজ্য হল এর প্রসিদ্ধ উদাহরণ। যে রাষ্ট্রের রাজা পাপী হয়, সেই রাষ্ট্রে কেউই সুখী থাকতে পারে না।

এইভাবে যে সাধক তার পরিবার ও সমাজকে নিজের ব্যবহার আর আচরণ দ্বারা সুখী করতে পারে না, সেই সাধক সাধক বলার যোগ্য হয় না। তাই

সাধকের উচিত যে সে তার জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রকে উন্নত করতে নিরন্তর চেষ্টা করতে থাকবে। সাধনার অর্থ জ্ঞান, বিজ্ঞান আর ক্রিয়া-কৌশল থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়া নয়, বরং সর্বহিতে এর পূর্ণ নিরাপদ ব্যবহার করাই এর কর্তব্য হয়। আবার এরদ্বারা মানুষ যেন কখনও বিলাসী না হয়ে যায়, এটাও সুনিশ্চিত করা অনিবার্য।

ওম্ তচ্চক্ষুর্দেবহিতম্ পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরত্। পশ্যেম শরদঃ শতম্ জীবেম শরদঃ শতম্ শৃণুয়াম শরদঃ শতম্ প্র ব্রবাম শরদঃ শতম্ অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতম্ ভূয়শ্চ শরদঃ শতাত্॥

[য়জুর্বেদ ৩৬.২৪]

এই মন্ত্রের ঋষি হল আথর্বণদধ্যঙ্। [**আথর্বণ দধ্যঙ্** = বাগ্বৈ দধ্যঙ্ ঙাথর্বণঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ৬.৪.২.৩)। **বাক্** = বাগ্বা অনুষ্টুপ্ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ১.২৮; শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৩.২.১৬)। **অথর্বা** = প্রাণো বা অথর্বা (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.৪.২.১)] এর অর্থ হল বিভিন্ন প্রাণ রশ্মির দ্বারা উৎপন্ন কিছু অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মি থেকে এই ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি হয়। এর দেবতা সূর্য আর ছন্দ ভুরিক্ ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ্ হওয়াতে এর দৈবত ও ছান্দস প্রভাবে সূর্যলোক তীক্ষ্ণ রক্তবর্ণীয় তেজ ও তীব্র বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল দ্বারা সমৃদ্ধ হতে থাকে।

আধিদৈবিক ভাষ্য

(**তত্, চক্ষুঃ, দেবহিতম্, পুরস্তাত্, শুক্রম্, উত্, চরত্**) [**শুক্রঃ** = শুক্রম্ হিরণ্যম্ (তৈত্তেরীয় ব্রাহ্মণ ১.৭.৬.৩), জ্যোতির্বৈ শুক্রম্ হিরণ্যম্ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ৭.১২)] বিভিন্ন দেব পদার্থকে নিজের গর্ভে ধারণকারী, সুবর্ণসম

তীব্র প্রকাশযুক্ত, অন্য লোকের প্রকাশক সেই সূর্যলোক নিজের নির্মাণ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই পূর্ব দিশার দিকে উৎকৃষ্টভাবে গমন করে। এর অর্থ হল গ্রহ আর সূর্যলোকের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে, একেই সূর্যলোকের উপরে ওঠা বলে।

(**পশ্যেম**, **শরদঃ**, **শতম্**) [**শরত্** = শৃণাতি য়েন সা (ঋতুঃ) (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৩.৫৭), স্বধা বৈ শরদ্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩.৮.১.৪), শরদ্ প্রতিহারঃ (ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ ৩.১), য়দ্ বিদ্যোততে তচ্ছরদঃ (রূপম্) (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.২.৩.৮), অন্নম্ বৈ শরদ্ (মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.৬.৯)।] এই সময় এই ছন্দ রশ্মির কারণরূপ বিভিন্ন অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মি সূর্যলোকের ভিতরে এক-একশ শরদ্ রশ্মিকে প্রভাবিত বা আকৃষ্ট করতে থাকে। এই শরদ্ রশ্মি তীক্ষ্ণতাপূর্বক অসুরাদি অনিষ্ট পদার্থকে নষ্ট করে বিভিন্ন ঋতু রশ্মির প্রহরী হয়ে বিভিন্ন কণা আদি পদার্থকে নানা প্রকারে প্রকাশিত করতে থাকে। এই শরদ্ রশ্মি স্বধারূপ হয়ে আর বিদ্যুৎকে ধারণকারী হয়ে সংযোগাদি কর্মকে সমৃদ্ধ করে।

(**জীবেম**, **শরদঃ**, **শতম্**) এই ঋষিরূপ অনুষ্টুপ ছন্দ রশ্মি সেই শত-শত শরত্ ঋতু রশ্মিকে নানা প্রকারে প্রাণাদি প্রাথমিক প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত করতে থাকে, বিশেষ করে প্রাণ, অপান ও ব্যান রশ্মির সঙ্গে। এর কারণ হল এই তিন প্রাণ রশ্মির বিশেষ ভূমিকা নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় ভাগের মধ্যে হতে চলা একীকরণ ক্রিয়াগুলোতে হয়। এখানে 'জীবেম' ক্রিয়াপদ এটাই দর্শায় যে প্রাণ রশ্মির সঙ্গে শরদ্ রশ্মির সঙ্গে-সঙ্গে এই ঋষিরূপ ছন্দ রশ্মিরও সঙ্গতি হয়। এইভাবে এই তিনটার মিশ্রণ হয়ে পদার্থের একীকরণ ক্রিয়া তীব্র হতে থাকে।

(**শৃণুয়াম**, **শরদঃ**, **শতম্**) সেই ঋষিরূপ অনুষ্টুপ ছন্দ রশ্মি সেই এক-একশ রশ্মির অনুকরণ করে সেগুলোর দিকে গমন করে, যারফলে সেই শরত্ রশ্মির সঙ্গে-সঙ্গে অন্য সব রশ্মি অধিক প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন সংযোগাদি কর্মকে সমৃদ্ধ

করতে থাকে। এখানে 'শৃণুয়াম' ক্রিয়াপদের অর্থ 'অনুকরণ করা' এবং 'গমন করা' গ্রহণ করা হয়েছে।

(**প্রব্রবাম**, **শরদঃ**, **শতম্**) এই ঋষিরূপ অনুষ্টুপ ছন্দ রশ্মি সেই শত-শত শরৎ রশ্মিকে অনেক প্রকারে প্রেরিত করতে থাকে। এই প্রেরণার জন্য সেই অনুষ্টুপ রশ্মি অন্য অনেক প্রকারের ছন্দ রশ্মিকে হয় প্রেরিত করে অথবা উৎপন্ন করে। ধ্যাতব্য হল অনুষ্টুপ ছন্দ রশ্মি যখন কোনো রশ্মির সম্পর্কে আসে, সেগুলোর প্রভাবকে তখন বাড়িয়ে দেয়। এই ক্রিয়া এখানেও হয়।

(**অদীনাঃ**, **স্যাম**, **শরদঃ**, **শতম্**) সেই অনুষ্টুপ ছন্দ রশ্মি সেই শত-শত শরদ্ রশ্মিগুলোর সঙ্গে [**দীনঃ** = দীয়তে ক্ষীণো ভবতীতি দীনঃ (উনাদি কোষ ৩.২)] কখনও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় না। বিভিন্ন অনিষ্ট রশ্মি অথবা অন্য কোনো কারণে সেগুলোর উপর কোনো দুষ্প্রভাব পড়ে না। এই কারণেই অনুষ্টুপ ছন্দ রশ্মি নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় ভাগে অন্য ছন্দ রশ্মিকে প্রেরিত করতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(**ভূয়ঃ**, **চ**, **শরদঃ**, **শতাত্**) এইসব পদের সঙ্গতি সম্পূর্ণ মন্ত্রের মধ্যে হয়। একটা ঋষিরূপ অনুষ্টুপ রশ্মি একশটা শরদ্ রশ্মির থেকেও অধিক রশ্মির সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। এখানে একশোর সংখ্যা হল ন্যূনতম সীমা।

আধ্যাত্মিক ভাষ্য

এই ভাষ্য আমরা ঋষি দয়ানন্দ কৃতই গ্রহণ করবো, সেটা হল এইরকম –

পদার্থ –

(তত্) চেতনম্ ব্রহ্ম (চক্ষুঃ) চক্ষুরিব সর্বদর্শকম্ (দেবহিতম্) দেবেভ্যো

বিদ্বদ্ভ্যো হিতকারি (পুরস্তাত্) পূর্বকালাত্ (শুক্রম্) শুদ্ধম্ (উত্) (চরত্) চরতি সর্বম্ জানাতি (পশ্যেম) (শরদঃ) (শতম্) (জীবেম) প্রাণান্ ধারয়েম (শরদঃ) (শতম্) (শৃণুয়াম) শাস্ত্রাণি মঙ্গলবচনানি চেতি শেষঃ (শরদঃ) (শতম্) (প্র, ব্রবাম) অধ্যাপয়েমোপদিশেম বা (শরদঃ) (শতম্) (অদীনাঃ) দীনতারহিতাঃ (স্যাম) ভবেম (শরদঃ) (শতম্) (ভূয়ঃ) অধিকম্ (চ) পুনঃ (শরদঃ) (শতাত্)।।

ভাবার্থ –

হে পরমেশ্বর! ভবত্কৃপয়া ভবদ্বিজ্ঞাতেন ভবত্সৃষ্টিম্ পশ্যন্ত উপয়ুঞ্জানাऽ রোগাঃ সমাহিতাঃ সন্তো য়ম্ সকলেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তাঃ শতাদ্বর্ষেভ্যোऽপ্যধিকম্ জীবেম সত্যশাস্ত্রাণি ভবদ্গুণাম্শ্চ শৃণুয়াম বেদাদীনধ্যাপয়েম সত্যমুপদিশেম কদাচিত্কেনাপি বস্তুনা বিনা পরাধীনা ন ভবেম সদৈবমাত্মবশাঃ সন্তঃ সততমা-নন্দেমান্যান্শ্চানন্দয়েমেতি।।

পদার্থ –

হে পরমেশ্বর! আপনি যে (দেবহিতম্) বিদ্বানদের জন্য হিতকারী (শুক্রম্) শুদ্ধ (চক্ষুঃ) নেত্র তুল্য সকলের দর্শনীয় (পুরস্তাত্) পূর্বকাল অর্থাৎ অনাদি কাল থেকে (উত্, চরত্) উৎকৃষ্টতার সঙ্গে সকলের জ্ঞাতা হন (তত্) সেই চেতন ব্রহ্ম আপনাকে (শতম্, শরদঃ) শত বর্ষ পর্যন্ত (পশ্যেম) দেখবো (শতম্, শরদঃ) শত বর্ষ পর্যন্ত (জীবেম) প্রাণকে ধারণ করবো, জীবিত থাকবো (শতম্, শরদঃ) শত বর্ষ পর্যন্ত (শৃণুয়াম) শাস্ত্র বা মঙ্গল বচন শুনবো (শতম্, শরদঃ) শত বর্ষ পর্যন্ত (প্রব্রবাম) পড়বো বা উপদেশ করবো (শতম্, শরদঃ) শত বর্ষ পর্যন্ত (অদীনাঃ) দীনতারহিত (স্যাম) হবো (চ) আর (শতাত্, শরদঃ) শত বর্ষেরও (ভূয়ঃ) অধিক দেখবো, জীবিত থাকবো, শুনবো, পড়বো, উপদেশ করবো আর অদীন থাকবো।

ভাবার্থ –

হে পরমেশ্বর! আপনার কৃপা আর আপনার বিজ্ঞান দ্বারা আপনার রচনাকে দেখে আপনার উপদেশ মেনে নিরোগ আর সাবধান হয়ে আমরা যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়যুক্ত হয়ে শত বর্ষেরও অধিক বর্ষ জীবিত থাকি, সত্য শাস্ত্র আর আপনার গুণগুলো শুনি, বেদাদি শাস্ত্র পড়ি, সত্যের উপদেশ করি, কখনও কোনো বস্তুর অভাবে পরাধীন না হই, সর্বদা স্বতন্ত্র হয়ে নিরন্তর আনন্দ ভোগ করি আর অন্যদেরও আনন্দিত করি।

এই মন্ত্রের উপর চিন্তন করার সময় সাধককে এমন চিন্তন করা উচিত যে ঈশ্বরের সানিধ্যকে প্রাপ্ত করে তার দেখা, বলা ও শোনার ক্ষমতাতে বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার আরোগ্যতা আর দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি হচ্ছে। সে নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে শক্তিকে প্রবাহিত হতে অনুভব করবে।

আধিভৌতিক ভাষ্য

(**তত্**, **চক্ষুঃ**, **দেবহিতম্**, **পুরস্তাত্**, **শুক্রম্**, **উত্**, **চরত্**) দেব অর্থাৎ বিদ্বান, দিব্যগুণ সম্পন্ন আধ্যাত্মিক জনদের সর্বদা হিতৈষী ব্যক্তিরাই রাজা হবার অধিকারী হন। সেইরকম রাজা সম্পূর্ণ প্রজার সহজ সুলভ মার্গদর্শক হন। [এখানে 'পুরস্তাত্' পদের সঙ্গে 'সহজসুলভম্' পদের অধ্যাহার করা উচিত।] সেই রাজা শুক্র অর্থাৎ শুদ্ধান্তঃকরণ যুক্ত তথা প্রজাকে ন্যায় প্রদানকারী আর তার প্রজার সব সুখ, দুঃখ ও ব্যবহার আর তাদের হিত-অহিতকে উৎকৃষ্টভাবে জানে। [**উচ্চরত্** = চরতি সর্বম্ জানাতি (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য)] এমন সেই মহান্ রাজাকে (**পশ্যেম**, **শরদঃ**, **শতম্**) আমরা শত বর্ষ পর্যন্ত দেখবো। (**জীবেম**, **শরদঃ**, **শতম্**) তার সুখদ সাম্রাজ্যে আমরা শত বর্ষ পর্যন্ত জীবন-

যাপন করবো। (**শৃণুয়াম**, **শরদঃ**, **শতম্**) শত বর্ষ পর্যন্ত বেদাদি সত্য শাস্ত্রকে শুনবো। (**প্রব্রবাম**, **শরদঃ**, **শতম্**) শত বর্ষ পর্যন্ত শাস্ত্রের উপদেশ করে অজ্ঞানান্ধকারকে নষ্ট করতে থাকবো। (**অদীনাঃ**, **স্যাম**, **শরদঃ**, **শতম্**) শত বর্ষ পর্যন্ত নিজের রাষ্ট্রে স্বতন্ত্র আর আত্মমর্যাদার সঙ্গে থাকতে পারি আর কখনো কোনো প্রকার যেন ক্ষীণতা প্রাপ্ত না হই। (**ভূয়ঃ**, **চ**, **শরদঃ**, **শতাত্**) সেই রাজার রাজ্যে না কেবল শত বর্ষ, অপিতু তারথেকেও অধিক উপরোক্ত সমস্ত কর্মকারী হতে পারি।

এখানে এই ভাষ্য থেকে দুটো সংকেত পাওয়া যায়, তারমধ্যে প্রথম হল সেই রাজা শত বর্ষেরও অধিক শাসনকারী হবে। দ্বিতীয় হল তার প্রজাজনও শত বর্ষের অধিক সুস্থ আর সুখী থেকে বিদ্যা আদি শুভ গুণ দ্বারা বিভূষিত হবে।

সাধকের উচিত যে স্বয়ংকে পূর্ণ সুস্থ আর বলবান্ বানানোর হেতু নিরন্তর উচিত আহার, ব্রহ্মচর্য পালন আদিকে সিদ্ধ করার চেষ্টা করবে। এইভাবে পরিবার আর সমাজের মধ্যেও এইরকম করার নিরন্তর প্রেরণা করবে।

গায়ত্রী-মন্ত্রঃ

ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তত্সবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াত্॥ [য়জুর্বেদ ৩৬.৩]

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে। তদনুসারে এখানেও পূর্বাপেক্ষা আরও অধিক গম্ভীরভাবে চিন্তর করবে। এই মন্ত্রের মানসিক জপ করা কালীন যত অধিক সময় পর্যন্ত বসে থাকতে পারবে, একাগ্র মনে বসে থাকবে। এরফলে সাধক বিশেষ আনন্দ আর অন্তঃকরণের বিশেষ পবিত্রতার অনুভব করবে।

সমর্পণম্

হে ঈশ্বর দয়ানিধে ! ভবত্কৃপয়াऽনেন জপোপাসনাদিকর্মণা ধর্মার্থকামমোক্ষাণাম্ সদ্যঃ সিদ্ধির্ভবেন্নঃ ।

গায়ত্রী মন্ত্রের পশ্চাৎ সাধক ভাববিভোর হয়ে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত হয়ে যায়। সে তার আরাধ্য পরব্রহ্ম পরমাত্মার কাছে আর্ত্ত স্বরে প্রার্থনা করতে থাকে যে হে দয়াময় ঈশ্বর! আপনার নিকট এই জপ এবং সন্ধ্যোপাসনা আদি কর্মের দ্বারা আমার ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষের সিদ্ধি দ্রুত প্রাপ্ত হোক। আমার জীবন এই সময় থেকে পূর্ণতঃ ধর্মময় হয়ে যাক, আমি যেন কখনও অধর্ম পথে চলার বিচার না করি। আমার জীবনে কখনও কোনো আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর অভাব না হয়। আমার সব কামনা পবিত্র এবং পূর্ণ হোক আর অন্তিমে আমি যেন আপনার অমৃতময়ী কোলে স্থান প্রাপ্ত করতে পারি, যাতে আমি সর্বদা পরমানন্দে থাকতে পারি।

নমস্কার-মন্ত্রঃ

ওম্ নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ।। [য়জুর্বেদ ১৬.৪১]

এই মন্ত্রের ঋষি হল পরমেষ্ঠী প্রজাপতি এবং দেবাঃ। [**পরমেষ্ঠী** = আপো বৈ প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠী, তা হি পরমে স্থানে তিষ্ঠন্তি (শতপথ ব্রাহ্মণ৮.২.৩.১৩)] এর অর্থ হল এই ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি বিভিন্ন তন্মাত্রা (কণা এবং বিকিরণ) থেকে উৎসর্জিত বা স্পন্দিত হওয়া প্রাণ রশ্মির দ্বারা হয়। এর দেবতা রুদ্র তথা ছন্দ

স্বরাডার্ষী বৃহতী হওয়াতে এর দৈবত ও ছান্দস প্রভাবে রুদ্র সঞ্জক তীক্ষ্ণ বিদ্যুদগ্নি পদার্থকে দ্রুত ঘনীভূত করতে থাকে বা বিভিন্ন কণাকে পরস্পর দ্রুত সংযুক্ত করতে থাকে।

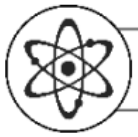

আধিদৈবিক ভাষ্য

(**নমঃ**, **শম্ভবায়**, **চ**, **ময়োভবায়**, **চ**) [এখানে 'চ' নিপাত পাদপূর্তির জন্য আছে।] ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেখানে য়জন ক্রিয়া হয়, একটা কণার দ্বারা অন্য কোনো কণার শোষণ হয়, সেখানে সেই পরিস্থিতির অনুকূল বজ্র রশ্মি উৎপন্ন হয়ে এই ক্রিয়াগুলোকে সরল আর ভারসাম্য সহিত সম্পন্ন করায়। এই ক্রিয়ার মধ্যে বিক্ষোভ উৎপন্ন হয় না, বরং ক্রিয়াগুলো সহজভাবে সম্পন্ন হয়।

(**নমঃ**, **শঙ্করায়**, **চ**, **ময়স্করায়**, **চ**) এখানে 'নমঃ' পদের অর্থ হল যজ্ঞ অর্থাৎ এই য়জন ক্রিয়া সেই দুই সংযুক্ত কণার জন্য ভারসাম্য এবং সহজ স্থিতি উৎপন্নকারী হয়। এর অর্থ হল যখন দুটো কণা পরস্পর সংযুক্ত হয়, তখন সেগুলো পূর্বাপেক্ষা ভারসাম্য আর সহজ স্থিতি প্রাপ্ত করে। এই কারণে এখানে 'নমঃ' পদকেই সেই কণাগুলোর জন্য শঙ্কর আর ময়স্কর বলা হয়েছে।

(**নমঃ**, **শিবায়**, **চ**, **শিবতরায়**, **চ**) 'শিবঃ শিব ইতি শময়ত্যেবৈনম্ (অগ্নিম্) এতদ্ হিম্সায়ৈ তথো হৈষ (অগ্নিঃ) ইমাম্ল্লোকাচ্ছান্তো ন হিনস্তি।' (শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.৭.৩.১৫)] সেই বজ্র রশ্মি আর সেগুলোর দ্বারা সম্পন্ন হওয়া য়জন ক্রিয়া নক্ষত্রের ভিতরে এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্য অনেক ক্ষেত্রের মধ্যে অগ্নিকে বিক্ষুব্ধ হওয়ার থেকে থামিয়ে রাখে আর তার প্রবলতাকে এত বাড়তে দেয় না যে সেই লোকের অস্তিত্বের উপরে সংকট এসে পড়বে। এখানে 'শিবতর' পদ

এই গুণেরই উৎকৃষ্টতাকে অধিক দর্শাচ্ছে। এইভাবে বজ্র রশ্মি না কেবল বাধক অসুরাদি পদার্থকে নষ্ট বা নিয়ন্ত্রিত করে, বরং দেব পদার্থকেও অতি উত্তেজিত বা বিক্ষুব্ধ হতে দেয় না।

আধ্যাত্মিক ভাষ্য

পরমপিতা পরমাত্মার নিকট ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ প্রাপ্তি হেতু প্রার্থনা করার পশ্চাৎ অন্তিমে সাধক ঈশ্বরের বিভিন্ন স্বরূপ স্মরণ করে নম্রীভূত হয়ে বলে –

(**নমঃ**, **শম্ভবায়**, **চ**, **ময়োভবায়**, **চ**) [**শম্** = ঐশ্বর্যসৌখ্যপ্রদঃ, শান্তিপ্রদঃ, আরোগ্যসুখদঃ, বিদ্যাব্যাপ্তিপ্রদঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.৯০.৯); **ময়োভবায়** = সর্বোত্তমসৌখ্য-প্রদায় (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৬.৪১)] আরোগ্য, শান্তি, ঐশ্বর্য, বিদ্যা প্রদানকারী এবং সর্বোত্তম সুখ প্রদানকারী ঈশ্বরকে আমি নমন করি।

(**নমঃ**, **শঙ্করায়**, **চ**, **ময়স্করায়**, **চ**) [**শঙ্করায়** = য়ঃ সর্বেষাম্ সুখম্ করোতি তস্মৈ (পরমেশ্বরায়) (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৬.৪১)] যিনি সবার জন্য সুখের বর্ষণকারী এবং মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ আর আত্মার সুখ প্রদানকারী হন, সেই পরমপিতা পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করি।

(**নমঃ**, **শিবায়**, **চ**, **শিবতরায়**, **চ**) [**শিবঃ** = কল্যাণকারী (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ২৫.৪৭), মঙ্গলময়োরূপো জ্ঞানময়ো বিজ্ঞানপ্রদঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ৩.৬৩); শিবম্ সুখনাম (নিরুক্ত ৩.৬)] সেই মঙ্গলময় আর কল্যাণকারী পরমাত্মা জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদানকারী এবং মুমুক্ষুদের অত্যন্ত সুখ

অর্থাৎ মোক্ষ প্রদানকারী হন, তাঁকে আমি বারংবার নমন করি।

এইভাবে স্মরণ করতে-করতে সাধক পরমাত্মার প্রতি নতমস্তক হয়ে শ্রদ্ধায় ভাববিভোর হয়ে ওঠে আর স্বয়ংকে পূর্ণরূপে পরমাত্মাকে সমর্পিত করে দেয়। সেই সময় অতি আনন্দের অনুভব করে সেই সাধক স্বয়ং পরমাত্মার আনন্দময়ী কোলে বসে থাকার অব্যক্ত সুখের অনুভূতিতে নিমগ্ন হয়ে ওঠে।

আধিভৌতিক ভাষ্য

(**নমঃ**, **শম্ভবায়**, **চ**, **ময়োভবায়**, **চ**) [**নমঃ** = জ্ঞানগ্রহণার্থে, নম্রত্বধারণে (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ২.৩২), সত্করণম্ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ১৬.২৯), অন্ননাম (নিরুক্ত ২.৭), য়জ্ঞো বৈ নমঃ (শতপথ ব্রাহ্মণ ২.৪.২.২৪); **শম্** = বিদ্যাব্যাপ্তিপ্রদঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ ঋগ্বেদ ভাষ্য ১.৯০.৯); **ময়োভবায়** = সর্বোত্তমসৌখ্যপ্রদায় (প.বি.)] বিবিধ বিদ্যা প্রদানকারী এবং বিদ্যা দান আদির দ্বারা সর্বোত্তম সুখ প্রদানকারী বিদ্বজ্জনদের থেকে আমরা জ্ঞান গ্রহণ করবো।

(**নমঃ**, **শঙ্করায়**, **চ**, **ময়স্করায়**, **চ**) [**শঙ্করায়** = কল্যাণ-কারকায় (প.বি.)] অর্থাৎ যারা নিজের বিদ্যার মাধ্যমে সবার (মন, বচন আর কর্ম দ্বারা প্রাণীমাত্রের) কল্যাণকারী এবং সর্বদা সব প্রাণীর সুখ চায়, এমন বিদ্বানদের সান্নিধ্যে আমরা নম্রতা ধারণ করবো।

(**নমঃ**, **শিবায়**, **চ**, **শিবতরায়**, **চ**) [**শিবঃ** = মঙ্গলময়োরূপো জ্ঞানময়ো বিজ্ঞানপ্রদঃ (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ৩.৬৩), কল্যাণকারী (মহর্ষি দয়ানন্দ য়জুর্বেদ ভাষ্য ২৫.৪৭), শিবম্ সুখনাম (নিরুক্ত ৩.৬)] তারা সকলকে মঙ্গলময় এবং কল্যাণকারী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদানকারী, পাপ কর্ম থেকে সরিয়ে শুভাচরণের

শিক্ষা প্রদানকারী হয় এবং যারা অত্যন্ত কল্যাণকারিণী দ্বারা পারমার্থিক সুখ প্রাপ্ত করিয়ে দেয়, এমন বিদ্বজ্জনদের আমরা সর্বদা সৎকার করবো। আমাদের উচিত যে এমন বিদ্বজ্জনদের বস্ত্র, ধন, অন্নাদির দিয়ে সৎকার করা তথা তাদের সঙ্গতি করা।

যারা সন্ধ্যোপাসনা করে তারা কখনো অহংকার, ক্রোধ ও ঈর্ষাদি দুরিতকে নিজের নিকটে আসতে দেয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত এইসব দুর্গুণ কোনো সাধকের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উচিত নিজেকে সাধক না মানা। যে ব্যক্তি অহংকার, ঈর্ষা, ক্রোধ, কাম আর লোভাদি দুর্গুণকে পালন করে অন্যকে সর্বদা নিচু দেখানোর চেষ্টা করে আর স্বয়ংকে সাধক, এমনকি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তা য়োগী ঘোষণা করে, তারা বড় ধরণের পাখণ্ডী হয়। সমাজের উচিত এমন ব্যক্তিদের বহিষ্কার করা, যাতে এমন পাখণ্ড সমাজে বৃদ্ধি না হয়।

ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অন্তিমে সাধক তিনবার ‘ওম্ শান্তি’র পাঠ করে আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক আর আধিভৌতিক দুঃখকে দূর করার প্রার্থনা করবে। এই প্রার্থনার সঙ্গে স্বয়ংও শান্তি আর আনন্দের অনুভব করে কিছু সময় শান্ত থাকবে। এরপর ধীরে-ধীরে নেত্র খুলে উঠে পড়বে।

আমি বৈদিক ভৌতিকীর পুনরুত্থানের মতো মহান উদ্দেশ্যের জন্য কীভাবে সহায়তা করতে পারি?

১. সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার করে – আমাদের পোস্ট, ভিডিও বা লেখ আদিকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে অধিক মাত্রায় প্রচারিত করতে পারেন।

২. স্বয়ং আর্থিক সহায়তা করে এবং অন্যকে দিয়ে করিয়ে – আপনি আপনার সামর্থ্য অনুসারে এবং ন্যাসের অনৈতিক ব্যবসা থেকে অর্জিত ধন না নেওয়ার শর্তকে মাথায় রেখে দান করতে পারেন আর নিজের আত্মীয় পরিজনদেরও এই রাষ্ট্রীয় এবং বৈদিক যজ্ঞতে আহুতি দেওয়ার জন্য প্রেরিত করতে পারেন।

৩. আমাদের সাহিত্যের প্রচার করে – আপনি পূজ্য আচার্য শ্রীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকগুলো অধিক মাত্রায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।

৪. বৈদিক ভৌতিকীর উপর কার্যক্রম আয়োজিত করিয়ে – আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক করে আপনার নিকটবর্তী অতি প্রবুদ্ধ, বিশেষ করে বিজ্ঞানের উচ্চস্তরীয় ছাত্রদের মাঝে কার্যক্রম করাতে পারেন।

৫. সোশ্যাল মিডিয়া, পত্রিকা আদিতে আমাদের কর্মের উপর লিখন লিখে অথবা ভিডিও বানিয়ে – আমাদের কাজকে সঠিকভাবে জেনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরল ভাষাতে জনসাধারণের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া এবং পত্রিকা আদিতে লিখন লিখতে পারেন অথবা ভিডিও বানাতে পারেন।

৬. বৌদ্ধিক সহায়তা দিয়ে – নতুন মৌলিক অনুসন্ধানের সংবাদ অথবা আমাদের অনুসন্ধানের কর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মেল দ্বারা আপনার পরামর্শ আমাদেরকে পাঠাতে পারেন।

৭. সরকারি সহায়তার জন্য চেষ্টা করে – আমাদের কাজের সংবাদ ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়ে এই কাজের জন্য সেখান থেকে সহায়তা আর সংরক্ষণের নিবেদন করতে পারেন।

৮. বেদবিজ্ঞানের অন্তিম লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছে – ভারত আর বিশ্বকে বেদোক্ত আদর্শে চালিয়ে সম্পূর্ণ মানবজাতির সাথে-সাথে প্রাণীমাত্রের কল্যাণের জন্য নিজের জীবনের দোষগুলোকে ত্যাগ করে আর শুভকর্মকে গ্রহণ করে।

৯. বৈদিক ভৌতিকীর উপর টেকনিক এবং গণিতের বিকাশ করে – বৈদিক সৈদ্ধান্তিক ভৌতিকীকে জনোপয়োগী বানানোর জন্য এর আধারে টেকনিক এবং গণিতের বিকাশ করার চেষ্টা করে।

১০. বেদবিরোধী অথবা জিজ্ঞাসুদের উত্তর দিয়ে – আপনি যাকিছু এ পর্যন্ত জেনেছেন, তার আধারে বেদাদি শাস্ত্রের উপর হতে চলা মিথ্যা আক্ষেপ অথবা বাস্তবিক জিজ্ঞাসুদের উত্তর দিয়ে আচার্য শ্রীর বহুমূল্য সময় বাঁচাতে পারেন।

* * * * *

বিনম্র নিবেদন

মান্যবর! আশা করি, আপনি আচার্যজীর কাজ আর গুরুত্বকে ভালো ভাবে জেনে গেছেন। যদি আপনার হৃদয় আর মস্তিষ্ক বেদের এই অপূর্ব কাজের জন্য উৎসুক হয়েছে আর আপনি আমাদের সহযোগিতা করতে চান, তাহলে আপনি আমাদের যজ্ঞতে নিম্ন প্রকারে সহযোগী হতে পারেন –

১. প্রতিবর্ষ ন্যূনতম ১২,০০০/- টাকা দান করে ট্রাস্টের সহযোগী সংরক্ষক হতে পারেন অথবা এক বার ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা দান করে আজীবন সহযোগী সংরক্ষক হতে পারেন।

২. প্রতিবর্ষ ন্যূনতম ৬,০০০/- টাকা দিয়ে বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হতে পারেন অথবা একসাথে ন্যূনতম ৫০,০০০/- টাকা দিয়ে বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হতে পারেন।

৩. বার্ষিক ন্যূনতম ১,০০০/- টাকা দিতে থেকে সহযোগী সদস্য হতে পারেন।

নোট – উপরোক্ত সকল সহযোগী মহানুভাবকে ন্যাসের সি.এ. দ্বারা করা বার্ষিক ওডিট রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যে মহানুভাব স্বয়ং দান করতে পাবেন না, সেই মহানুভাব অন্যদের প্রেরিত করে অন্ততঃ ৮ সদস্য আদি বানিয়ে স্বয়ং নিঃশুল্ক সেই শ্রেণীর সদস্য বা সহযোগী সংরক্ষক আদি হতে পারেন।

৪. বয়োবৃদ্ধ বিদ্বান, সন্ন্যাসী, সাধু, মহান বৈজ্ঞানিক মহানুভাব নিজের আশীর্বাদ তথা বৌদ্ধিক সহায়তা দিতে পারেন।

৫. বিদ্যার্থী, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী আদি নিজের পবিত্র আহুতি শ্রদ্ধা ও সামর্থ্য অনুসারে প্রদান করতে পারেন।

বিশেষ নিবেদন

এই কাজ অত্যন্ত পবিত্র, এই কারণে আচার্য শ্রীর ভাবনানুসারে বিনম্র নিবেদন যে যাদের আজীবিকা কোনো ধরণের হিংসা, চুরি, চোরাচালান, অশ্লীলতাবর্ধক সাধন, নেশা জাতীয় বস্তুর বিক্রি, প্রতারণা, শোষণ আদির উপর নির্ভর করে তথা যে সকল নির্ধন ভাই নিজের সামর্থ্যের অধিক (অথবা নিজের পরিবারের ক্লেশ করে) দান দিতে চাইছেন, এমন মহানুভাবদের সদ্ভাবনার ধন্যবাদ করেও আমরা তাদের দান নিতে সক্ষম নই। দয়া করে এমন করার চেষ্টা করে আমাদের লজ্জিত করবেন না। তবে হ্যাঁ, যে বন্ধু এমন কাজকে ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে জুড়তে চান, তাহলে তাদের সাদর আমন্ত্রন জানাই। সংস্থানের সঞ্চালন হেতু দয়া করে এই দুটো খাতায় দান করতে পারেন –

Bank Name	**Punjab National Bank**
A/c Holder	Shri Vaidic Swasti Pantha Nyas
A/c Number	4474000100005849
Branch	Bhinmal
IFS Code	PUNB0447400

অথবা

Bank Name	**State Bank of India**
A/c Holder	Shri Vaidic Swasti Pantha Nyas
A/c Number	61001839825
Branch	Khari Road, Bhinmal
IFS Code	SBIN0031180

জ্ঞাতব্য হল, বৈদিক বিজ্ঞানের অগ্রিম এবং উচ্চ স্তরীয় বিশাল শোধ সংস্থান হেতু ৩০ বিঘা ভূমি সিরোহী (রাজস্থান) নগর থেকে রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ–৬২ থেকে প্রায় সোয়া কি.মি. দূর পালড়ী (এম) রাজস্ব গ্রামের মধ্যে ক্রয় করা

হয়েছে। এই সংস্থানের নির্মাণের আনুমানিক বাজেট হল ১০ কোটি টাকা। যে মহানুভাব এই মহান যজ্ঞতে নিজের পবিত্র আহুতি (বড় রাশি) দিতে ইচ্ছুক, তারা নিম্ন লিখিত খাতাতে ধন দান করতে পারেন।

Bank Name	**Axis Bank**
A/c Holder	Shri Vaidic Swasti Pantha Nyas
A/c Number	921010017739651
Branch	Bhinmal
IFS Code	UTIB0003757

আপনি আপনার চেক/ড্রাফ্ট/ধনাদেশ, **'শ্রী বৈদিক স্বস্তি পন্থা ন্যাস'** PAN No. AAATV7229A এর নাম (কেবল খাতায় দিবেন) দেওয়ার কষ্ট করবেন, তার সঙ্গে দয়া করে নিজের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট অক্ষরে লিখে অবশ্যই পাঠিয়ে দিবেন। আপনি অনলাইনেও ধন জমা করতে পারেন, কিন্তু এমন করা মহানুভাব নিজের নাম ও ঠিকানা দুর্ভাষ দ্বারা তৎকাল সূচিত করার কষ্ট করবেন যাতে সঠিক সময়ে রশিদ পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে, অন্যথা আমাদের অনেক কঠিন হয়ে যায়।

নোট – ন্যাসকে দেওয়া দান আয়কর অধিনিয়ম ১৯৬১ ধারা ৮০–জি অন্তর্গত কর মুক্ত আছে।

* * * * *

The Ved Science Publication

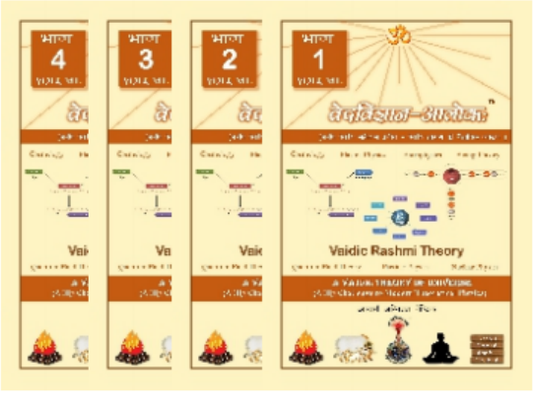

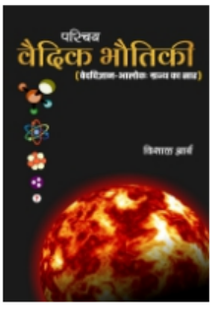

परिचय
वैदिक भौतिकी

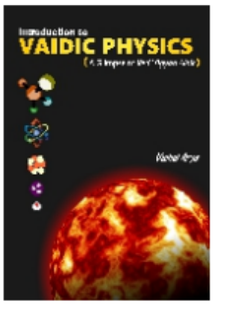

Introduction to
Vaidic Physics

बोलो! किधर जाओगे?
आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक

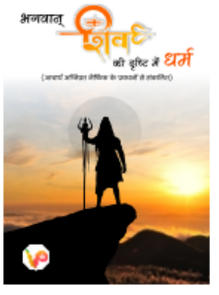

भगवान् शिव की दृष्टि में धर्म
आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक

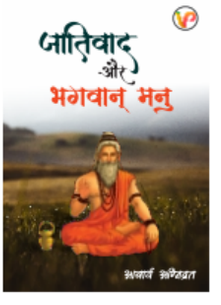

जातिवाद और भगवान् मनु
आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक

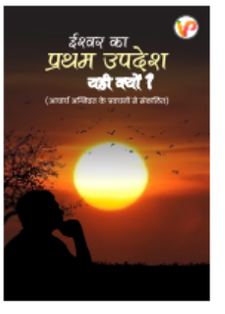

ईश्वर का प्रथम उपदेश यही क्यों?
आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक

सत्यार्थ प्रकाश
आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक

मांसाहार
आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक

विज्ञान क्या है?
आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक

What is Science?
आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक

We are dedicated to Publish, Promote and Sell texts that illuminate *Vaidika* science and Knowledge...

Contact us:

thevedscience.com thevedscience@gmail.com 9530363300

বৈদিক

সন্ধ্যা

“ঈশ্বরের পূজা-পদ্ধতি বাস্তবে এমন হওয়া উচিত, যারদ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ আর তাঁর গুণ, কর্ম ও স্বভাবের বিধিবৎ জ্ঞান হতে পারে। এইরূপ হলে সৃষ্টিরও বোধ হবে আর সৃষ্টিতে বসবাসকারী অন্য প্রাণীদের সাথে কি সম্বন্ধ আছে, তারও বোধ হবে আর তদনুকূলই সবার সাথে তাদের প্রীতি আর ন্যায়পূর্বক ব্যবহারও হবে।

আচার্য **অগ্নিব্রত**

/vaidicphysics